অক্টোবর ২০০৬ ● দশ টাকা

আনন্দমেলা

পুজোর ছুটি কাটানোর তরতাজা

১০টি গল্প

লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দুলেন্দ্র ভৌমিক, স্মরজিৎ শূর রায়, প্রচেত গুপ্ত, উল্লাস মল্লিক, অশোক বসু, সৌরভ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রুজ এবং কৃষ্ণেন্দু বসাক



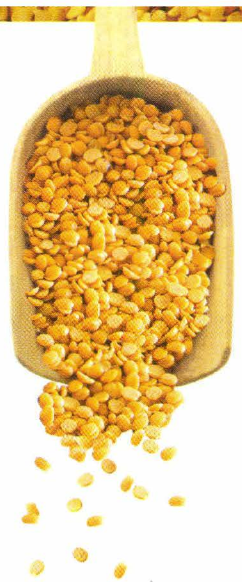
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পের জমজমাট কমিক্স (দ্বিতীয় কিস্তি)

বিপিনবাবুর বিপদ

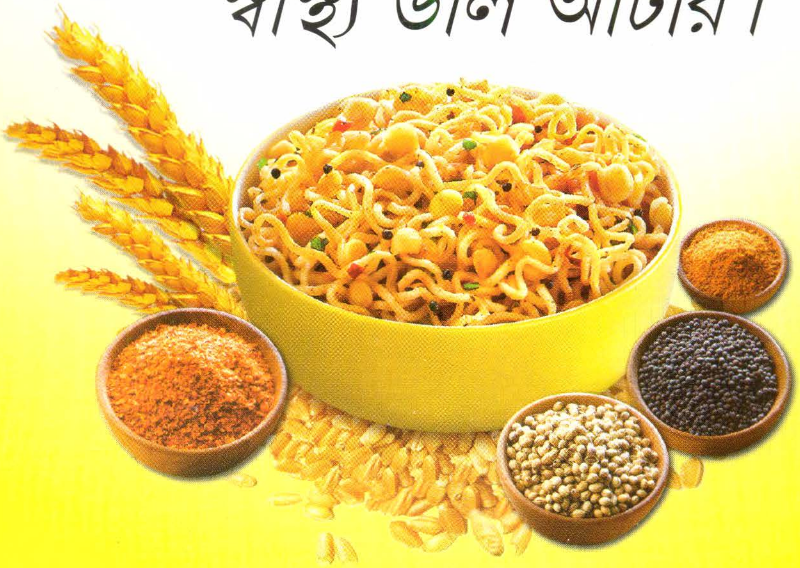
বিদায় টেনিস

আন্দ্রে আগাসি

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা



স্বাদ সাম্বারের,
স্বাস্থ্য ডাল আটার।



HIGH IN FIBRE
POWER OF PROTEIN
GOODNESS OF DAL

এসে গেল নতুন MAGGI DAL ATTA NOODLES। আটা, **ডায়েটরি ফাইবার** এর গুণ প্রদান করে, আর ডাল ও আটার সংমিশ্রণ সরবরাহ করে **প্রোটীন**-এর ক্ষমতাকে। প্রতিটি প্যাক আপনার বাচ্চার ডায়েটরি ফাইবার ও প্রোটীনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার (RDA)* প্রায় ২০% মেটাতে পারে।

আর এই সবকিছুই পাওয়া যাবে **সাম্বারের** দুর্দান্ত স্বাদে।



সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর

PUBLICIS 512 06

*Recommended Dietary Allowances for children of 7-9 yrs as per 'Nutritive Value of Indian Foods', ICMR, Reprinted '04

আনন্দমেলা

৩২ বর্ষ ৬ সংখ্যা আশ্বিন ১৪১৩ অক্টোবর ২০০৬

পুজোর ছুটি কাটানোর তরতাজা ১০টি গল্প



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মজাদার গল্পের জমজমাট রঙিন কমিক্স

নফরগঞ্জের নবীন চোর চিতেন রামভজনের জুতো-মোজা খুলে দেওয়ার অছিলায় দু'টো পকেটে ব্লেড চালিয়েও হিরে বা মোহর কিছুই পেল না। চিতেনের চুরিতে কাঁচা হাত দেখে রামভজন পরামর্শ দিলেন, কুড়োরহাটের সামন্তর কাছে যাও সে তোমাকে চুরিবিদ্যা শিখিয়ে দেবে। রামভজন এও জানালেন, তাঁর সব সম্পত্তি দেখে গজানন, ফুলকলি আর নরহরিরা। এরা কারা? এরা নাকি সব অশরীরী। কী ঘটল তারপর?

ছবি: স্বপন দেবনাথ।



অন্যান্য পাতায়

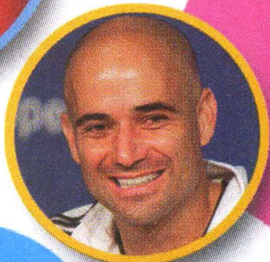
প্রচ্ছদ: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্রের মডেল: আরাত্রিকা
মেকআপ: অরূপ অধিকারী
(৯৮৩০১ ২২০০৪)
ফোটো: প্রদীপ আদক

সম্পাদক: **পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার**

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

খেলাধুলো



আশ্চর্য পৃথিবী

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ভালবেসে গিয়েছেন পশু-পাখিদের। মাত্র ছ' বছরের জন্মদিনে তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল একটা ১২ ফুট লম্বা পাইথন। তিনি বাঘের বাচ্চা হাতে তুলে নিতেন, ঝাঁপিয়ে পড়তেন জলে কুমিরের উপর। তাই তাঁকে 'ক্রোকোডাইল ট্র্যাপার', 'ক্রোকোডাইল হান্টার', কত নামেই না চিনত পৃথিবীর মানুষ!







'আতশবাজির দীপাবলি' ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

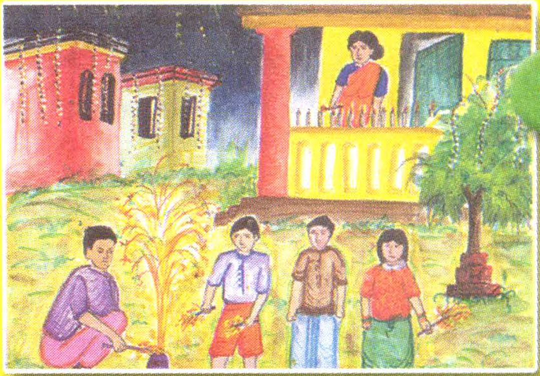
পাঠকের পাতা

সৈয়দ জেবা জামন *সপ্তম শ্রেণি*
ওয়েল্যান্ড গোল্ড স্মিথ স্কুল, কলকাতা-৭০০ ০১২



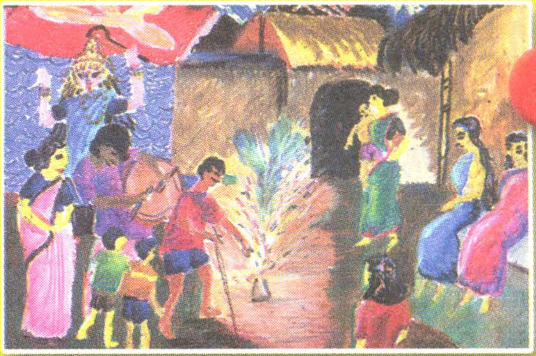
১

অনিন্দ্যশঙ্কর নাথ *সপ্তম শ্রেণি*
রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০৫১



২

রায়ান গোস্বামী *পঞ্চম শ্রেণি*
ভারতীয় বিদ্যাভবন, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৯৭



৩

দোলন দত্ত *অষ্টম শ্রেণি*
তাহেরপুর নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়, নদিয়া-৭৪১ ১৫৯



৩

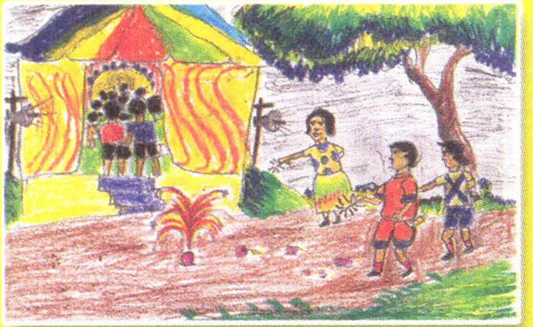
এবারের প্রতিযোগিতা

নভেম্বর মাসের ২১ তারিখ 'ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন ডে'। এই উপলক্ষে তোমাকে যদি তোমার পছন্দের টিভি চ্যানেল তৈরি করতে দেওয়া হয়, তবে কী কী বিষয় রাখবে সেই 'আমার মনের মতো চ্যানেল'-এ, ১০ টি বাক্যে লিখে পাঠাও আমাদের। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো তারাই শুধু লেখাটি লিখে পাঠাবে ২০ অক্টোবর তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যয়িত করিয়ে দিও। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা নভেম্বর সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।

ঠিকানা: **পাঠকের পাতা**
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

এ ছাড়া আরও যাদের ছবি ভাল লেগেছে

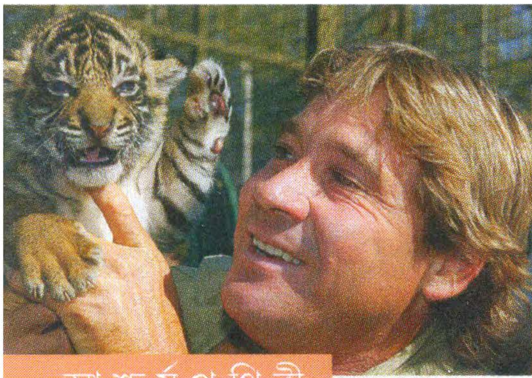
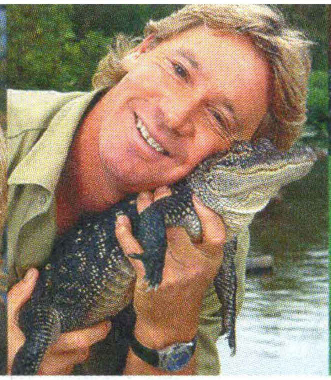
সুচয়ন বিশ্বাস *চতুর্থ শ্রেণি*
পাঠভবন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ



সোহম দে সরকার *ষষ্ঠ শ্রেণি*
হরিপাল জি ডি ইনস্টিটিউশন, হুগলি




Dabur RED Toothpaste & anandamela আনন্দমেলা
present
Dental Care Camp
লবঙ্গ, পুদিনা, তোমর
এবার দাঁতের প্রবলেম
চল হট!
নতুন প্যাক
डाबर
लाल दन्त मंजन
स्वस्थ मसूड़े मज़बूत दाँत
তোমার দাঁতের পরীক্ষা করতে ডাক্তারকাকু আসছেন তোমার স্কুলে। জেনে নাও কী করে দাঁত রাখবে সজীব-সতেজ।
Dabur RED Toothpaste
With the goodness of Laung, Pudina and Tomar
Strong teeth. Keeps dental problems away.
Radio Partner
RED FM 93.5
Bajaate Raho
লবঙ্গ দাঁতের ব্যথার সঙ্গে লড়ে।
তোমর জীবাণু ধ্বংস করে।
পুদিনা নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ রোধ করে।


স্টিভ আরউইন বেঁচে থাকবেন আমাদের মনে

'ক্রোকোডাইল ট্র্যাপার', 'ক্রোকোডাইল হান্টার'- কত নামেই না তাঁকে চিনত পৃথিবীর মানুষ। অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানায় মোড়া ছিল তাঁর জীবন। লিখেছেন

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার ছলেই স্টিভ আরউইন... না, হাতি নয়, তবে বিষধর সাপ কিংবা বাঘের বাচ্চা হাতে তুলে নিতেন যখন-তখন! জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন কুমিরের সঙ্গে। সত্যিই এই অসীম সাহসী মানুষটি এমন সব কাণ্ডকারখানা করতেন, যা সহজেই হার মানায় অবিশ্বাস্য সব গল্পকেও।

এহেন স্টিভের মর্মান্তিক মৃত্যুটাও হল অদ্ভুতভাবে! 'অ্যানিমাল প্ল্যানেট' চ্যানেলের এই উপস্থাপকের আজব কাণ্ডগুলোর সঙ্গে যারা পরিচিত, তারা বুঝতেই পারছিল না একটা নিরীহ শংকর মাছ বা স্টিং রে-র কাঁটার আঘাতে কীভাবে মৃত্যু হতে পারে স্টিভের! তবু গত ৪ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটা নির্মমভাবেই সত্যি।



আমরা বরং এখানে মৃত্যুর কথা ভুলে জেনে নিই স্টিভ আরউইনের জীবনের দুর্ধর্ষ কিছু ঘটনার কথা। স্টিভের জন্ম ১৯৬২ সালে। তাঁর ছ' বছরের জন্মদিনে কী উপহার দেওয়া হয়েছিল বলো তো? মাত্র ১২ ফিট লম্বা একটি পাইথন! আর কুমিরের দেখাশোনার ভার তিনি পেয়েছিলেন ন' বছর বয়সে! আসলে ১৯৭০ সাল নাগাদ তাঁর মা এবং বাবা কুইন্সল্যান্ডে 'রেপটাইল অ্যান্ড ফনা পার্ক' নামে একটি চিড়িয়াখানা খোলেন। স্টিভের যাবতীয় কীর্তিকলাপের হাতেখড়ি ওই পার্ক থেকেই। এরপর স্টিভ পাড়ি দেন উত্তর কুইন্সল্যান্ডে, যেখানে তিনি কাজ করতেন একজন 'ক্রোকোডাইল ট্র্যাপার' হিসেবে। অর্থাৎ, জনবহুল এলাকা থেকে কুমির সরানোর কাজ করতে হত তাঁকে। তখন স্টিভের বয়স মাত্র ১৭।

টেলিভিশনে ১৯৯৬ সালে স্টিভ আরউইন এবং তাঁর স্ত্রী টেরি-র পরিকল্পনায় 'দ্য ক্রোকোডাইল হান্টার' নামে অনুষ্ঠানটা প্রথম দেখানো হলেও, সেই ১৯৭৯ থেকেই বোধ হয় তাঁর সঙ্গে এই ডাকনামটা জুড়ে গিয়েছিল। এই শো-ই স্টিভকে এনে দেয় বিশ্বজোড়া খ্যাতি। এই অনুষ্ঠানের শুটিং করার সময় কতবার যে ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাঁকে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। কুমির হাত কামড়ে ধরেছে, লেকে তাড়া করেছে জলহস্তী, বিষাক্ত সাপের ছোবল থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন...! কিন্তু কোনও বিপদই দমিয়ে রাখতে পারেনি তাঁকে।

অবশ্য এসব করতে গিয়ে স্টিভ মাঝে-মাঝে জড়িয়ে পড়েছেন বিতর্কেও। স্টিভ ও তাঁর দল নাকি বিরক্ত করেছেন তিমি, সিল, পেঙ্গুইনদের! আর কোলে এক মাসের ছেলে ববকে নিয়ে কুমিরকে মাংস খাওয়ানোর জন্য অনেকেই স্টিভের তীব্র সমালোচনাও করেছিল।

স্টিভ সত্যিই ভালবাসতেন পশু-পাখিদের। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন বড় মাপের। ২০০৩ সালে সি-লায়নের উপর তিনি একটি তথ্যচিত্র বানাচ্ছিলেন মেক্সিকোর একটি উপদ্বীপে। তিনি জানতে পারেন দু' জন স্কুবা-ডাইভার ওই জায়গাতেই নিখোঁজ হয়েছেন। স্টিভ এবং তাঁর গোটা টিম শুটিংয়ের কাজ বন্ধ রেখে শুরু করে দেন খোঁজ। একজন ডাইভারকে উদ্ধারও করেন তাঁরা।

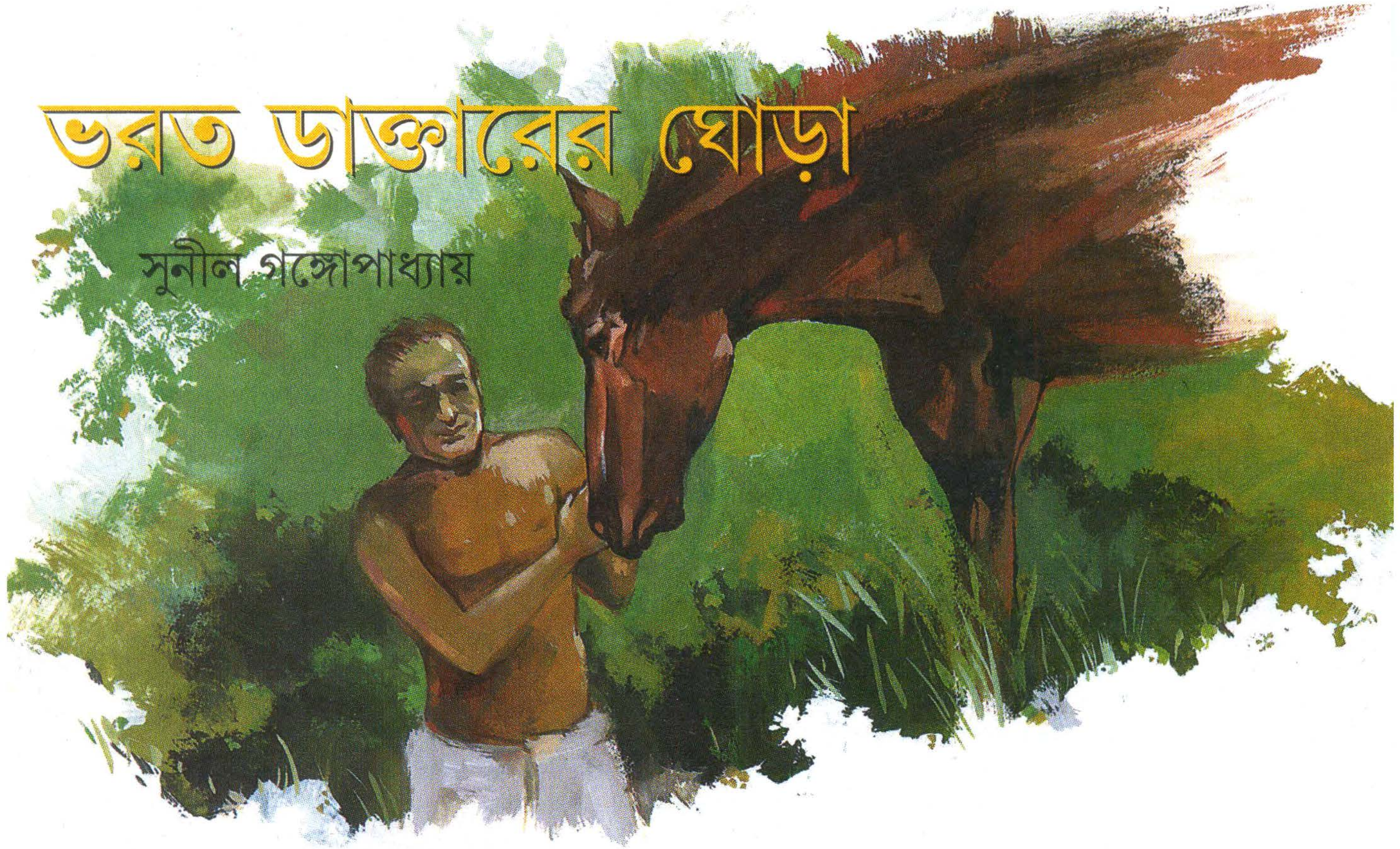
চোরাশিকারিদের তীব্র নিন্দে করতেন স্টিভ। তিনি একবার বলেছিলেন, "এই হিটলারেরা প্রাণী মেরে টাকা রোজগার করে। আমি এর বিরুদ্ধে লড়ব।"

কিন্তু লড়াইটা বড় আচমকাই থেমে গেল। অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফে 'দ্য ওশনস ডেডলিয়েস্ট' নামে একটি তথ্যচিত্রের শুটিংয়ের সময় একটি শংকর মাছ হুল দিয়ে স্টিভের হৃৎপিণ্ড এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো ধরা আছে ক্যামেরায়। প্রাণশক্তিতে ভরপুর এই মানুষটি নিজের মৃত্যু নিয়েও মজা করতে ছাড়েননি। বলেছিলেন, "আমার মৃত্যুর সময় ক্যামেরাটা যেন চালু থাকে। একটা অ্যালিগেটর যদি আমায় চিবিয়ে খেয়েও নেয়, তবুও।" স্টিভ যেন জানতেনই, বিছানায় শুয়ে সাধারণভাবে তাঁর মৃত্যু হবে না!

তবে স্টিভ আরউইন আমাদের মনে বেঁচে থাকবেন আরও অনেক দিন।

ভরত ডাক্তারের ঘোড়া

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



কাছাকাছি আট-দশখানা গ্রামের মধ্যে একজনই ডাক্তার। ভরত ডাক্তার। তাঁর উপর সবারই খুব বিশ্বাস। কয়েকজন কবিরাজ আছেন ঠিকই। কিন্তু কবিরাজ তো আর ডাক্তার নন। সিরাজসাহেব হেকিমি চিকিৎসা করেন, কিন্তু সে-ও তো হেকিমি, ডাক্তারি নয়। লোকের ধারণা, ভরত ডাক্তার বিলিতি ওষুধ দেন, তাতেই সব রোগ সারে। তা ছাড়া, তিনি সুই দেন মাঝে-মাঝে। অর্থাৎ ইঞ্জেকশন। তা তো কবিরাজ কিংবা হেকিম দিতে পারেন না।

ভরত ডাক্তার বেশ ভাল ডাক্তার এবং ভাল মানুষ। দূর-দূর গ্রামের লোক তাঁকে ডাকলেই তিনি চলে যান। গোলগাল ফরসা চেহারা, একটু বেঁটে, মাথায় সুন্দর চকচকে টাক।

তখনকার দিনে গ্রামে রাস্তাঘাট প্রায় কিছুই ছিল না। বর্ষার সময় লোকে যাতায়াত করত নৌকোয়, আর গ্রীষ্মকালে জল শুকিয়ে গেলে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। সরু আলপথ কিংবা এবড়োখেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে সাইকেল চালানোও খুব কষ্টকর।

কিন্তু একজন ডাক্তার কী করে হেঁটে-হেঁটে রুগি দেখতে যাবেন? তা হলে তো দু'-তিন জায়গার বেশি যাওয়াই যায় না। অথচ শীত শেষ হতে না-হতেই মানুষের খুব রোগভোগ শুরু হয়।

তাই ভরত ডাক্তার রুগি দেখতে যান ঘোড়ায় চেপে। ভরা বর্ষার সময় নৌকো। অন্য সময় ঘোড়া। ডাক্তার ছোটখাটো মানুষ বলে তাঁর ঘোড়াটিও তেমন বড় নয়। কখনও খুব জোরে ছোটে না।

ঘোড়ায় একটা সুবিধে, সকাল-দুপুর-রাত যে-কোনও সময়েই নিয়ে যাওয়া যায়। ঘোড়ারা সহজে ক্লান্ত হয় না, তাদের ঘুমও কম। পেট ব্যথা থেকে মাথা ব্যথা, সবরকম চিকিৎসাই করতে হয় ভরত ডাক্তারকে। তাই এক-একদিন রাত-বিরেতেও তাঁর ডাক পড়ে। রুগির এখন-তখন অবস্থা, ভরত ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিলেই সে বেঁচে উঠবে। অনেকে মাঝ-রাতেও শুনতে পায় ঘোড়ার পায়ের কপ-কপ শব্দ, তাতে বুঝে যায় ভরত ডাক্তার কোথাও কোনও মুমূর্ষুকে বাঁচাতে যাচ্ছেন।

ভরত ডাক্তারের ফি মাত্র দু' টাকা। কেউ-কেউ তা-ও দিতে পারে না। কেউ-কেউ কাঁচুমাচু মুখ করে মাথা চুলকে বলে, "ডাক্তারবাবু, হাতে তো এখন পয়সাকড়ি নেই, পরে শোধ করে দেব। যদি দয়া করেন।"

ভরত ডাক্তার জানেন, পরে আর কেউ শোধ করে না। তবু রাগারাগি করেন না তিনি। উদারভাবে বলেন, "ঠিক আছে। তোকে পয়সা দিতে হবে না। আমার ঘোড়াটার জন্য এক বস্তা ঘাস পাঠিয়ে দিস। কিংবা, তোদের ঘরের মাচায় তো দেখলাম, দু'টো বেশ পুরুষ্টু লাউ ঝুলছে, তার একটা দে, অনেক দিন লাউয়ের শুক্তো খাইনি।"

ডাক্তারের এই উদারতার সুযোগ নিয়ে কারও-কারও কাছে টাকা থাকলেও তা না দিয়ে কিছু জিনিস দিতে চায়। একটা লাউয়ের দাম মোটে চার আনা, আর এক বস্তা ঘাস বড় জোর আট আনা।

সব রুগিই তো আর শেষ পর্যন্ত বাঁচে না। দুনিয়ার কোনও ডাক্তারই বাঁচাতে পারেন না সব মানুষকে। কোনও বাড়িতে রুগির মৃত্যু হলে ভরত ডাক্তার ফি তো নেনেই না। বরং পকেট থেকে দু'-পাঁচ টাকা বের করে দেন শ্মশান খরচের জন্য।

ডাক্তারের বাড়ির লোক অবশ্য এমন উদার নন। এত নাম করা ডাক্তার কিন্তু টাকা-পয়সা এত কম উপার্জন করেন বলে বকাবকি করেন তাঁর বউ। দু'টো ছেলে আছে, মহা বিচ্ছু। রাত্তিরে বাবা বাড়ি ফিরলেই তারা তাঁর পকেট হাতড়ে দেখে, তারপর ঠোঁট উলটে বলে, "মোটে এই!"

ডাক্তারের ঘোড়াটির নাম ছোট্টু। তার

দেখাশুনো করে বদন ভুঁইমালি। সে ছোট্টুকে ঘাস খাওয়ায়, ছোলা খাওয়ায়, দলাইমলাই করে। আর সপ্তাহে একদিন গায়ে জল ঢেলে স্নানও করিয়ে দেয়। অন্য কেউ ছোট্টুর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে এলে ছোট্টু তা মোটেই পছন্দ করে না, জোরে-জোরে মাথা নাড়ে আর ছিঁ-হি-হি করে ডেকে ওঠে।

ঘোড়ার দেখাশুনো ছাড়াও এ বাড়ির আরও অনেক কাজ করতে হয় বদনকে।

বদনের কাছে ডাক্তারবাবু যে স্বয়ং এক দেবতা। কোনওদিন তিনি বদনকে বকাবকি করেন না। মাস-মাইনে ছাড়াও তিনি বদনকে এক টাকা-দু' টাকা বকশিশ দেন, বদনের বাবা সাধুচরণকে সাপে কামড়ে ছিল, তাকে পর্যন্ত সারিয়ে তুলেছিলেন ভরত ডাক্তার। তাঁর ওষুধের এমন গুণ।

এক ঝড়-জলের রাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন ভরত ডাক্তার। তাঁর গায়ের জামা ছেঁড়া, মুখে ফালা-ফালা দাগ, সেখান থেকে রক্ত পড়ছে, ফুলে গিয়েছে একটা চোখ। সোনালি ফ্রেমের চশমাটাও নেই।

কী হয়েছে? কী হয়েছে?

ডাক্তারবাবু একেবারে চুপ।

বউ, ছেলেমেয়ে কারওর প্রশ্নেরই তিনি জবাব দেন না। পোশাক বদল করে তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছু খাবারও খেলেন না।

এরপর দু'দিন ডাক্তারবাবু ওই একইরকম রইলেন, কোনও কথাও বললেন না, রুগি দেখতেও বেরোলেন না। অবশ্য ঝড়-বৃষ্টি চলছেই।

পাড়া-প্রতিবেশীরা দেখা করতে এল অনেকেই। ডাক্তারবাবু কথা বলছেন না বলে কেউ কিছু জানতেও পারল না। তখন কেউ-কেউ বলতে লাগল, "ডাক্তারবাবুকে ডাকাত ধরেছিল নিশ্চয়ই।"

তাতে কয়েকজন বলল, "যাঃ, তা হতেই পারে না। এ তল্লাটের সবাই ডাক্তারবাবুকে ভালবাসে। ডাকাতরাও তাঁকে দেখলে প্রণাম করে। কত দিন তিনি কত রাতে বাড়ি ফিরেছেন। কখনও কিছু হয়নি।"

আর ক'জন বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই ভূতে ধরেছিল। ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করলেও তো কেউ-কেউ ভূত হয়, সেরকম কোনও ভূত যদি রেগে থাকে!"

তা শুনে একজন বলল, "আরে কী যে বলো! কেউ মরলেও মরতে-মরতে ভাবে, ডাক্তারবাবু যথাসাধ্য করেছেন, নেহাত আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই মরতে হল। ডাক্তারবাবুর উপর রাগ করবে কেন? তা ছাড়া তিন-চার দিনের মধ্যে তো এই তল্লাটের কেউ মরেনি।"

এই সব তর্কাতর্কিতে আসল ব্যাপারটা আর বোঝা গেল না।

তৃতীয় দিনে ডাক্তারবাবু বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বসে রইলেন কিছুক্ষণ। উঠোনের এক পাশে একটা গোয়ালঘর, তার পাশে একটা আস্তাবল। সেখানে বদন দলাইমলাই করছে ঘোড়াটাকে।

এক সময় ডাক্তারবাবু হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, "এই বদন শোন। এদিকে আয়।"

বদন কাছে এসে প্রণাম করে উবু হয়ে বসল।

ডাক্তারবাবু বললেন, "বদন রে, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। আমার মৃত্যুদিন ঘনিয়ে এসেছে।"

তা শুনে বদন দারুণ চমকে উঠে বলল, "এ কী কথা বলেন কর্তা? আপনি কত মানুষকে চিকিৎসা করে বাঁচাচ্ছেন। আপনি নিজের দু'ফোঁটা ওষুধ খেলেই তো সেরে উঠবেন। আপনি মরবেন কেন?"

ডাক্তারবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ওরে, ডাক্তাররা নিজের চিকিৎসা করতে পারে না। ডাক্তারদেরও মরতে হয়। আমি বুঝে গিয়েছি, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।"

তা শুনেই বদন ফ্যাচ-ফ্যাচ করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার কয়েকটা কথা মন দিয়ে শোন। আমি মরে গেলে তোকে বোধ হয় আর এ বাড়িতে কাজে রাখবে না। আমার ছেলেরা তোকে পছন্দ করে না। তা তুই অন্য বাড়িতে কাজ পেয়ে যাবি। কিন্তু আমার ঘোড়াটার কী হবে বল তো?"

বদন চোখ মুছে বোকার মতো বলল, "আপনার ঘোড়া? ছোট্টু? তার কী হবে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "হ্যাঁ রে, আমার ছেলেরা ছোট্টুকেও পছন্দ করে না। ওকেও রাখবে না। বিক্রি করে দেবে! তারপর?"

বদন বলল, "বিক্রি করে দেবে? তারপর?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "বিক্রি করে দিলে কে কিনবে জানি না। যদি কোনও গাড়িওয়ালাকে দেয়, সে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে রোজ চাবুক মারবে। তা হলে আমি মরে গিয়েও শান্তি পাব না। ছোট্টু আমার কত সার্ভিস দিয়েছে। বদন, ছোট্টুকে আমি তোর হাতে দিয়ে যাব। তুই আগের মতোই ওর দেখাশুনো করবি। প্রতিজ্ঞা কর। তুই ওকে কোনও দিন বিক্রি করে দিবি না?"

বদন প্রথমে আনন্দে ডগমগ হয়ে বলল, "কর্তা, ছোট্টু আমার কাছে থাকবে? আহা-হা, কী ভাল। কী ভাল! কোনও দিন ওকে বিক্রি করব না। তা হলে আমার পাপ হবে! তিন সত্যি করছি, কোনও দিন ওকে বেচব না।"

তারপরই সে মুখ শুকনো করে বলল, "কিন্তু কর্তা, আমি গরিব মানুষ। আমি একটা ঘোড়া পালব কী করে? অন্য বাড়িতে চাকরি করলে কী করে ওর দেখাশোনা করব? ছোলা আর বিচালি কেনার পয়সাই বা পাব কোথায়?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তাও তো কথা বটে। গচ্চা তো আছেই। ঠিক আছে, আমি একটা কিছু ব্যবস্থা করে যাব, যাতে তুই মাসে-মাসে কিছু টাকা পাবি!"

পরদিনই মারা গেলেন ডাক্তারবাবু। একেবারে জলজ্যান্ত অবস্থায়। রাত্তিরে ঘুমিয়ে ছিলেন, সকালবেলা আর জাগলেন না।

বদনের জন্য ডাক্তারবাবু কী ব্যবস্থা করে গেলেন তা জানা গেল না। বোধ হয় তিনি সময় পাননি।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বদনকে বললেন, "কাল থেকে আর তোকে আসতে হবে না। আমরা কম টাকায় অন্য লোক রাখব। তুই বুড়ো হয়ে গিয়েছিস, তোকে দিয়ে আর চলবে না।"

বদন গিন্নিমাকে প্রণাম করে ছোট্টুকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। পরদিন সকালেই ডাক্তারবাবুর ছেলে সুধীর বদনের বাড়িতে এসে খুব চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল।

সে বলল, "তুই কোন সাহসে আমাদের ঘোড়া নিয়ে চলে এলি? তুই একটা চোর। তোকে পুলিশে দেওয়াই



উচিত। নেহাত পুরনো লোক বলে দিচ্ছি না।"

বদন যতই বলে, ডাক্তারবাবু ঘোড়াটা তাকেই নিতে বলেছেন, তা সুধীর শুনতেই চায় না। সে জোর করে ছোট্টুকে নিয়ে চলে গেল, বদন কোনও বাধাই দিল না।

সন্ধেবেলাই ফিরে এল ছোট্টু। বদনের বাড়ির কাছে এসে চিঁ-হি-হি করে ডাকল।

দু'দিন পরে সুধীর এসে আবার অনেক গালাগালি করে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ছোট্টুকে। এবার সে ছোট্টুকে বিক্রি করে দিল কলিমুদ্দিন মিঞার কাছে। কলিমুদ্দিনের দু'খানা ঘোড়ার গাড়ি আছে। তার মধ্যে একটা ঘোড়ার মার খেতে-খেতে খুব কাহিল অবস্থা।

সেখান থেকেও পালিয়ে এল ছোট্টু। সে যেন ঠিক জানে, ডাক্তারবাবুর মনের কথা।

কলিমুদ্দিন মিঞা যখন জানতে পারল যে ঘোড়াটা ফিরে গিয়েছে বদনের কাছে, তখন সে কিন্তু রাগারাগি করল সুধীরের উপরেই। বদনের দোষ কী? সে তো ঘোড়া চুরি করে আনেনি। ঘোড়া নিজে থেকে তার বাড়ি চলে এলে সে কী করবে?

চারদিকে রটে গেল, ডাক্তারবাবুর ঘোড়া বদন ছাড়া আর কারওর বাড়িতেই থাকবে না। তা হলে আর এ ঘোড়া কে কিনবে?

তারপর থেকে ছোট্টু রয়ে গেল বদনের কাছে। কিন্তু সে গরিব মানুষ, ঘোড়া দিয়ে কী করবে? অন্য একটা বাড়িতে সে কাজ পেয়েছে, সেখানে সারাদিন খাটতে হয়। ঘোড়ায় চড়ার সময়ই বা সে পাবে কখন, আর ঘোড়ায় চড়ে সে যাবেই বা কোথায়?

এক-একদিন ভোরবেলায় ঘোড়াটা নিয়ে বেরোলে মাঠের লোকেরা তাকে দেখে হাসে, ঠাট্টা করে। কেউ-কেউ চেঁচিয়ে বলে, "কী রে বদন, ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিস নাকি? ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সদ্দার।"

কেউ বলে, "এই রে, গরিবের ঘোড়া রোগ হয়েছে!"

দিনেরবেলা আর সে ঘোড়া নিয়ে বেরোয় না। কোনও কাজেই লাগে না। তাও তো ঘোড়াকে খাওয়াতে হয়। ঘাস কাটার সময় পায় না সে। ছোলাটোলা কিনতেও তো পয়সা লাগে। কিন্তু সে ডাক্তারবাবুর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছে, ঘোড়াটার কখনও অযত্ন করবে না। মহা মুশকিল!

বদনের ছেলে নেই, আছে দু'টি মেয়ে আর বউ। তারা তো জানেই না কী করে ঘোড়ার যত্ন নিতে হয়। বদনই রাত্তিরে ফিরে এসে ছোট্টুকে দলাইমলাই করে। নিজেরা আধপেটা খেয়েও ছোট্টুকে খেতে দেয়। ঘাস-বিচালির বদলে ছোট্টুকে ভাত কিংবা রুটি দিলেও দিব্যি খেয়ে নেয় সে। তাকে বেঁধে রাখা হয় না, সারাদিন সে বাড়ির আশপাশেই ঘোরাফেরা করে, দূরে কোথাও যায় না।

মাঝে-মাঝে বদন ছোট্টুর সঙ্গে কথাও বলে। ছোট্টুও যেন বুঝতে পারে সব কিছু। বদন তার ঘাড়ে চাপড় মেরে বলে, "ও রে ছোট্টু রে, আমি তোকে ঠিক মতো যত্ন করতে পারি না। আমরা যে বড় গরিব।"

ছোট্টু মুখ দিয়ে ফ-র-র-র শব্দ করে। যেন এইটুকু আদর পেয়েই সে খুব খুশি।

একদিন বদন ভাবল, বেশি রাত্তিরে ছোট্টুকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এলেই তো হয়। রাত্তিরে তো কেউ দেখতে পাবে না, কেউ ঠাট্টাও করবে না। তা ছাড়া ঘোড়ার মতো একটা প্রাণীকে তো মাঝে-মাঝে ছোটানোও দরকার। দৌড়দৌড়ি না করলে ঘোড়ার পায়ে বাত হয়।

ছোট্টুর পিঠে জিন পরিয়ে বদন চেপে বসল। সঙ্গে-সঙ্গে ছোটা শুরু করল ছোট্টু মনের আনন্দে। প্রথমে আস্তে, তারপর বেশ জোরে।

আকাশ পরিষ্কার, ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, তার মধ্যে ঘোড়া ছোটাতে ভারী আরাম। বদনের মনে হল, সে যেন বদন ভুঁইমালির মতো একজন সাধারণ এলেবেলে মানুষ নয়, সে একজন সেনাপতি। হাতে তলোয়ার নেই, এই যা!

বদন ভেবেছিল সে শুধু গ্রামের চারপাশটা ঘুরে আসবে। কিন্তু খানিক বাদে সে ফিরতে চাইলেও ছোট্টু ফিরবে না। সে ছুটতে লাগল আপন খেয়ালে। বেশ জোরে। বদন তাকে থামাতেই পারছে না।

দু' খানা গ্রাম ছাড়িয়ে ছোট্টু এসে থামল একটা বড় বাড়ির সামনে। দু' পা তুলে চিঁ-হি-হি করে ডাকল। সেই ডাক শুনে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। একজন লোক অবাক হয়ে বলল, "ডাক্তারবাবুর ঘোড়া! ও মা ডাক্তারবাবু এসেছেন! ডাক্তারবাবু, আসুন-আসুন। আমাদের রতনের খুব জ্বর। আপনি কী করে জানলেন?"

সেদিকের আকাশ মেঘলা। বাইরেটা বেশ অন্ধকার। ঘোড়ার পিঠে কে বসে আছে তা বোঝা যায় না। অন্য লোকটি বলল, "যাঃ, ডাক্তারবাবু তো স্বর্গে গিয়েছেন, তিনি কী করে আসবেন? এ অন্য কেউ।"

বদন তখন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "বাবুরা আমায় মাপ করবেন। আমি বদন ভুঁইমালি। ডাক্তারবাবুর ঘোড়াটা আমার কাছে এখন থাকে।"

একজন বলল, "অ, তাই বলো। তা তুমি এখানে এলে কী জন্য? কিছু দরকার আছে?"

বদন বলল, "আজ্ঞে না। এধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। ঘোড়াটা এখানেই একবার থামল।"

অন্যজন জিজ্ঞেস করল, "আমাদের রতনের ধুম জ্বর। এত রাতে ডাক্তার-বদ্যি কোথায় পাব! তুমি কি চিকিৎসার কিছু জানো? তুমি তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ছিলে।"

বদন জিভ কেটে বলল, "বাবু, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। ওষুধ-বিসুধের কিছুই জানি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের বাড়ির ছেলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠুক।"

ছোট্টু এবার ছটফটিয়ে উঠল। উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে শুরু করল দৌড়। সোজা বদনের বাড়ি।

এর দু' দিন পর আবারও ঠিক ওই রকম ব্যাপার হল। বেশি রাত্তিরে বদন ছোট্টুর পিঠে চাপতেই সে ছুটতে লাগল আপন খেয়ালে।

এবারে গিয়ে থামল অন্য দিকের আর-একটা গ্রামের একটা বাড়ির সামনে। এ বাড়ির ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে কান্নার আওয়াজ। কেউ বুঝি মারা গিয়েছে। ভয় পেয়ে বদন কাঁপা গলায় বলল, "এ কোথায় এলি রে ছোট্টু? চল-চল ফিরে চল।"

ছোট্টু মুখ দিয়ে ফ-র-র-র শব্দ করল।

এবাড়ি থেকেও একজন লোক বেরিয়ে এসে খুব অবাক হল। ভরত ডাক্তারের ঘোড়াকে অনেকেই চেনে। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এবাড়িতেই আগে এসেছে

কয়েকবার। আজ সেই ঘোড়ার পিঠে কে?

বদন হাত জোড় করে বলল, "আমায় মাপ করবেন বাবু। আমি অতি সামান্য লোক। এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম।"

লোকটি বলল, "আমার মেয়ে মায়ারানির ভেদবমি শুরু হয়েছে সন্ধে থেকে। এখন-তখন অবস্থা। ডাক্তারবাবুর ঘোড়ায় চাপো, তুমি কি চিকিৎসার কিছু জানো?"

এখানেও লজ্জা পেয়ে সে বলল, "আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। ওসব কিছুই জানি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার মেয়ে সেরে উঠবে।"

তৃতীয়বার মাঝরাত্তিরে ছোট্টু বদনকে নিয়ে এল আর-একটা বাড়ির সামনে। এটা বেশ বড় বাড়ি, কোনও জমিদার-টমিদারের হবে বোধ হয়। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। তারাও বদন ডাক্তারের ঘোড়াটাকে চেনে। যে এখন ঘোড়াটা চলাচ্ছে, তাকে চেনে না। একজন লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে হে? তুমি বুঝি এই ঘোড়াটা কিনেছ?"

বদন বলল, "আজ্ঞে না। ঘোড়া কিনব সে সামর্থ্য আমার কোথায়? আমি অতি গরিব লোক, ডাক্তারবাবু এ ঘোড়াটা আমায় দিয়ে গিয়েছেন।"

লোকটি কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, "আহা, ডাক্তারবাবু ছিলেন অতি মহৎ মানুষ। শেষবার তো এবাড়িতেই ছোট কত্তার চিকিৎসে করতে এসেছিলেন। সে রাতেই তিনি ফেরার সময় ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিলেন। লোকে বলে, শ্মশানতলায় একটা বটগাছের ডাল নেমে এসে ওঁকে খুব মেরে ছিল। লোকে তো কত কথাই বলে। অমন একজন মানুষকে একটা গাছ মারবে কেন? হয়তো ঝড়ে গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়েছিল মাথায়। যাই হোক, তুমি যে আজ এই সময় এলে? তুমি কি কোনও খবর পেয়েছ?"

বদন হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে না। কীসের খবর?"

লোকটি বলল, "আমার মাতৃদেবী আজ চলে যাচ্ছেন। এখন-তখন অবস্থা। কবিরাজ-বদ্যিরা সব জবাব দিয়ে গিয়েছেন। সারাদিন ধরে অজ্ঞান, শুধু শ্বাস আছে একটু-একটু। তোমাকে দেখে ভাবলাম, তুমি বুঝি কোনও ওষুধ এনেছ। এখন তো আর কোনও আশা নেই, যে যা বলছে তাই শুনছি।"

বদন অন্য দিনের মতো কাঁচুমাচু মুখে বলল, "আজ্ঞে, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, ওষুধের কথা কিছুই জানি না।"

বাড়ির সামনের উঠোনে একটা খাটের উপর শুইয়ে রাখা রয়েছে বৃদ্ধাকে। একজন তাঁর মুখে গঙ্গাজল দিচ্ছে। বদন ঘোড়া থেকে নেমে সেই খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। তার মনে পড়ল নিজের মায়ের কথা। চোখে জল এসে গেল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "হে ভগবান, ভাল করে দাও, ভাল করে দাও!" ফেরার পথে সে রাতে বদন বকুনি দিতে লাগল ছোট্টুকে। ছোট চাপড় মেরে সে বলল, "তুই এটা কী করিস ছোট্টু? শুধু-শুধু আমাকে এক-একজন রুগির বাড়িতে নিয়ে আসিস! মানুষের রোগভোগের কষ্ট দেখতে কি ভাল লাগে? আমারও কষ্ট হয়। আর আমি রাত্তিরেও তোকে নিয়ে বেরোব না।"

দু' দিন বাদে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ঘোড়া ছুটিয়ে একজন এল বদনের বাড়িতে। তিনি পুলিশের দারোগা। এ তল্লাটে জমিদার, ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগারাই তো ঘোড়া হাঁকান। বদনের মতো গরিব লোকের তো ঘোড়া থাকার কথা নয়।

দারোগাসাহেব বদনকে ডেকে বললেন, "ডাক্তারবাবু তাঁর এই ঘোড়াটা তোমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন?"

বদন বলল, "আজ্ঞে, সে কথাটা শুধু ভগবান জানেন। ডাক্তারবাবু তো আর কাউকে কিছু বলে যাননি। কেউ যদি অবিশ্বাস করতে চায়, আমি নিরুপায়।"

দারোগা বললেন, "তুমি ঘোড়া নিয়ে কী করবে? বিক্রি করে দাও না কেন?"

বদন বলল, "আমি বিক্রি করতে পারব না। ডাক্তারবাবুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি। তবে কেউ যদি জোর করে নিয়ে যেতে চায়, আমি আর কী করে বাধা দেব? এ ঘোড়া কিন্তু অন্য কারওর কাছে থাকতে চায় না।"

দারোগা বললেন, "হুঁঃ, বাধা নেই তো দেখছি। শোনো বদন, তুমি যে সে রাতে জমিদার মুরারি চৌধুরীর বাড়িতে গিয়েছিলে, কেউ তোমাকে খবর দিয়েছিল?"

বদন বলল, "আমি সামান্য মানুষ, আমায় কে খবর দেবে? কেনই বা খবর দেবে?"

দারোগা বললেন, "ভরত ডাক্তারকে যেই কল দিত, রাত-বিরেতে হলেও তিনি ঠিক যেতেন। তুমি গিয়েছিলে কেন?"

বদন বলল, "তাও জানি না হুজুর। ঘোড়াটাই আমাকে ওখানে নিয়ে গেল।"

দারোগা ঘোড়াটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন, "এর মধ্যে এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে। ও বাড়ির বুড়ি মায়ের তো সেদিন মরণ একেবারে ঘনিয়ে এসেছিল। কবিরাজি চিকিৎসায় কোনও কাজ হয়নি। দু'-একজন বলেছিল, ভরত ডাক্তার বেঁচে থাকলে হয়তো কিছু একটা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো আর নেই। এর কিছু পরেই ভরত ডাক্তারের ঘোড়া নিয়ে তুমি উপস্থিত হলে সেখানে। তারপর দু' ঘণ্টা যেতে না-যেতে বুড়ি চোখ মেললেন। আজ তো তিনি নিজে স্নান করতে গেলেন পুকুরঘাটে। একেবারে সুস্থ। তোমাদের দেখেই নাকি এমনটা হয়েছে। নইলে তো কোনও ক্রমেই বাঁচার কথা নয়। সেই জন্য জমিদারবাবু তোমাকে আর ওই ঘোড়াকে পঞ্চাশটা টাকা উপহার পাঠিয়েছেন।"

বদন চক্ষু চড়কগাছে তুলে বলল, "পঞ্চাশ টাকা? সে তো আমি কখনও একসঙ্গে দেখিনি!"

শুধু তাই নয়, এর পর জানা গেল, আর যে দু'টো বাড়িতে ছোট্টু নিয়ে গিয়েছিল বদনকে, সে দু' বাড়ির রতন আর মায়ারানিও সেরে উঠেছে একেবারে। তারাও কিছু টাকা পাঠাল।

চারিদিকে রটে গেল ভরত ডাক্তার বেঁচে না থাকলেও এখনও তিনি চিকিৎসা চালাচ্ছেন। অনেক বাড়ি থেকে এখন বদন আর ছোট্টুর ডাক পড়ে। ইচ্ছে থাক বা না থাক, বদনকে যেতেই হয়। সে ওষুধ দেয় না, শুধু প্রার্থনা করে। তাতেই অনেক রুগি সেরে ওঠে। যে কয়েকজন সারছে না, তাদের বাড়ির লোক ধরে নেয়, তাদের আয়ু একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছে। আয়ু না থাকলে ডাক্তার কী করবে!

ওই সব বাড়ি থেকেই বদন এখন এক টাকা-দু' টাকা কিংবা লাউ-কুমড়ো, কিংবা ছোট্টুর জন্য ঘাসের বস্তা পায়।

ভরত ডাক্তার বদনকে যে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা রেখেছেন।

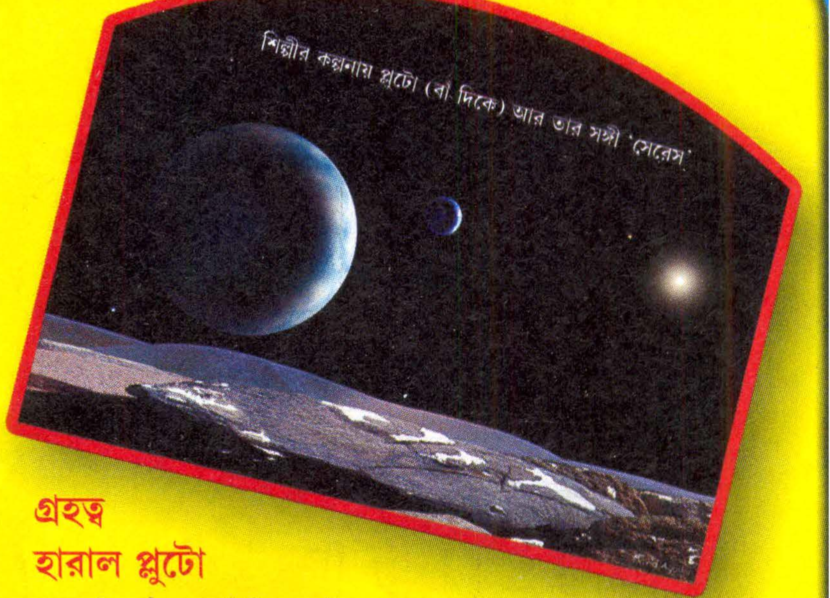
ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

চাঁদের মাটিতে অজানা রহস্যের সন্ধানে

রবিবারের সুন্দর এক সকাল। অজানা রহস্যের সন্ধানে চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়ল ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির মহাকাশযান 'স্মার্ট ওয়ান লুনার প্রোব'। চাঁদের 'লেক অফ এক্সেলেন্স'-এর খুব কাছেই ঘটল এই ঘটনা।

২০০৫ সাল থেকে চাঁদের কক্ষপথে ঘুরে তাকে স্টাডি করে যাচ্ছিল স্মার্ট ওয়ান। চাঁদের জন্মরহস্য সংক্রান্ত নানা তথ্য এত দিন বিজ্ঞানীদের পাঠিয়ে এসেছে এই স্পেস প্রোব। তারপর একদিন এল সেই বিশেষ দিন, এই স্পেস প্রোবকে কক্ষচ্যুত করে চাঁদের মাটিতে আছড়ে ফেললেন বিজ্ঞানীরা। ঘটল বিস্ফোরণ, সঙ্গে আলোর ঝলকানি। আর সেই দৃশ্য পৃথিবী থেকে প্রত্যক্ষ করলেন তাঁরা। আবেগে আপ্লুত হয়ে স্মার্ট ওয়ান প্রোজেক্টের বিজ্ঞানী বার্নার্ড ফোয়িং বললেন, "বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছি। ভয়ংকর সুন্দর এক বিস্ফোরণের সাক্ষী হয়ে রইলাম আমরা।"

ঘণ্টায় ৭,২০০ কিলোমিটার গতিতে স্পেস প্রোবটি আছড়ে পড়েছিল চাঁদের মাটিতে। এই সংঘর্ষের ফলে চাঁদের বুকে কয়েক বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে যে বিপুল পরিমাণ ধুলোর সৃষ্টি হয়েছে, টেলিস্কোপে চোখ রেখে তা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানতে পারছেন অজানা অনেক তথ্য।


শিল্পীর কল্পনায় প্লুটো (বাঁ দিকে) আর তার সঙ্গী 'সেরেস'

গ্রহত্ব হারাল প্লুটো

অনেকেই আশায় বুক বাঁধছিলেন, সৌরজগতের সদস্যসংখ্যা এবার বাড়বে। নয় থেকে গিয়ে দাঁড়াবে বারোয়। কিন্তু তা তো হলই না, উলটে কমে গেল! এবার থেকে আটটি গ্রহ নিয়েই সংসার চালাতে হবে সূর্যকে। কারণ, ন'নম্বর গ্রহ প্লুটোকে আর গ্রহ বলতে আর রাজি নন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (আই এ ইউ)-এর বিজ্ঞানীরা। প্লুটো এখন থেকে আর গ্রহ নয়, বামন গ্রহ! সেই সঙ্গে প্লুটোর সঙ্গী হল 'সেরেস', আর '২০০৩ ইউ বি ৩' (জেনা)। তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন, এই আটটি মহাজাগতিক বস্তু হল 'কুলীন' গ্রহ, আর প্লুটো ও তার দুই সঙ্গী এখন থেকে 'বামন' গ্রহ। কিন্তু কী দোষ করেছিল প্লুটো যে, গ্রহত্ব হারাতে হল? আসলে কুলীন গ্রহের সংজ্ঞা এরকম, প্রথমত, তাকে সূর্য বা অন্য নক্ষত্রের চার পাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিজের ভর এত বেশি হতে হবে, যাতে তার অভিকর্ষজ বল তাকে একটি গোলকের আকৃতি দিতে পারে। তৃতীয়ত, এই অভিকর্ষজ বল তার কক্ষপথের চার পাশের বস্তুকে সরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এই তিনটি শর্তের মধ্যে দু'টি শর্ত ঠিকমতো মেনে চললেও তিন নম্বর শর্ত, অর্থাৎ নিজের কক্ষপথের চার পাশের বস্তুকে অভিকর্ষজ বলের সাহায্যে সরিয়ে দিতে পারবে না যারা, তাদেরই বলা হবে বামন গ্রহ। আর এজন্যই প্লুটোকে বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দিতে হল গ্রহের 'আসন'।

ডাইনোসর নিয়ে গবেষণা

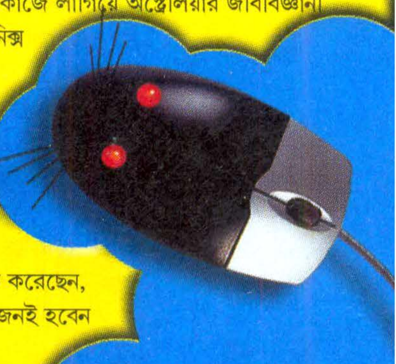


পৃথিবীতে ডাইনোসরের সংখ্যা মোট কত? খুড়ি, কত ছিল? কোনও ধারণাই নেই বিজ্ঞানীদের। মোট কত বর্গের ডাইনোসর ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে? এত দিন বিজ্ঞানীরা যা ভেবে এসেছিলেন, তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। মোট সংখ্যার মাত্র তিরিশ শতাংশের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন আজ পর্যন্ত। ৭০ শতাংশ এখনও অজানা! পেনসিলভানিয়ার সোয়ার্থমোর কলেজের পরিসংখ্যানবিদ স্টিভ ওয়াং এবং ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়ার প্যালিয়েন্টোলজিস্ট পিটার ডডসন জটিল সব হিসেবনিকেশ করে জানিয়েছেন এই তথ্য। তাঁরা বলছেন যে, মাত্র ৫২৭টি বর্গের ডাইনোসরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এত দিনে। সম্ভবত এই সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াবে ১,৮৫০-এ। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার, অজানা এই ডাইনোসরদের সম্বন্ধে কিছুই জানা যাচ্ছে না। কারণ, সেগুলোর কোনও ফসিল খুঁজে পাচ্ছেন না গবেষকরা।

(সঙ্গের ছবিটি ডাইনোসরের মডেল)

ক্রায়োনিক্স সেন্টার ঠান্ডায় জমিয়ে রাখবে জীবন্ত মানুষ

আজ থেকে দু'শো কি পাঁচশো বছর পর কীরকম হবে আমাদের পৃথিবী? কেউই জানতে পারব না তা। বিজ্ঞানের এই দ্রুত অগ্রগতি আজকের পৃথিবীকে কোথায় পৌঁছে দেবে, তা কে জানে! কিন্তু আমরা কেউ যদি বেঁচে থাকি ওই সময়, তা হলে! প্রশ্ন হল, এ কি সম্ভব? বিজ্ঞান বলছে অবশ্যই সম্ভব, যদি জীবদেহকে মাইনাস দেড়শো থেকে দু'শো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বছরের পর-বছর জমাট বাঁধিয়ে রেখে, তারপর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে সেই জীবদেহকে সচল করে তোলা যায়। ফলে ওই জীবদেহের পচন হবে না। বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম 'ক্রায়োনিক্স'। বিজ্ঞানের এই শাখাকে কাজে লাগিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জীববিজ্ঞানী ফিলিপ রোডস সিডনির কাছে একটি ক্রায়োনিক্স সেন্টার তৈরি করতে চান। সেখানে তিনি জমিয়ে রাখবেন সেই সব মানুষের দেহ, যাঁরা কিনা নিজের চোখে দেখতে চান আজ থেকে কয়েকশো বছর পরের পৃথিবীকে। মুশকিল হল, কেউই রাজি হচ্ছেন না নিজের উপর এই ভয়ংকর এক্সপেরিমেন্ট করতে। তাই ফিলিপ ঠিক করেছেন, তিনি নিজে আর তাঁর পরিবারের লোকজনই হবেন এই এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ!



জয় সেনগুপ্ত

মাসির বাড়ি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



নবাবগঞ্জে পৌঁছে সে শুনল, মাদলপুরের শেষ বাস সন্ধেবেলা ছেড়ে গিয়েছে। রাতে ওদিকে যাওয়ার যানবাহন বলতে কিছু নেই।

শুনে অগাধ জলে পড়ল গয়ারাম। ট্রেনটা তিন ঘণ্টা লেট না করলে এতক্ষণে তার মাসির বাড়িতে পৌঁছে বিকেলের ফলার সেরে ওঠার কথা। খিদেও বড় কম পায়নি। মাত্র বাইশ বছর বয়স। গোবিন্দপুর গাঁ থেকে টানা তিন মাইল হেঁটে এসে ট্রেন খারাপ। রাস্তায় একটু বাদামভাজা ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। পয়সা বেশি নেইও সঙ্গে। রাস্তায় চোরে-ডাকাতে কেড়ে নেবে বলে মা রাস্তা খরচটুকু ছাড়া আর মাত্র পাঁচটা টাকা দিয়েছেন। অবশ্য মাসির বাড়ি পৌঁছে গেলে আর চিন্তা নেই। কিন্তু পৌঁছনো নিয়েই চিন্তা।

তার মাসতুতো দাদা কালীশঙ্করের বিয়ে। কাল ভোরবেলা বরযাত্রীরা বর নিয়ে রওনা হয়ে যাবে। কালীদার ভাবী শ্বশুরবাড়ি নাকি একবেলার পথ। খানিকটা নৌকোয় গিয়ে তারপর হাঁটাপথ। অবশ্য বরযাত্রীদের জন্য গোরুর গাড়ি আর বরের পালকিও থাকবে। আর বরযাত্রী যাওয়ার জন্যই তাড়াহুড়ো করে আসা। মাসি পইপই করে আসার জন্য চিঠি লিখেছেন।

কিন্তু গয়ারাম এখন করে কী?

নবাবগঞ্জ জায়গা মন্দ নয়, দোকান-বাজার আছে, স্টেশন আছে, পোস্ট অফিস আছে। মাদলপুর অবশ্য নিকষ্যি গাঁ। নবাবগঞ্জ আর মাদলপুরের মাঝখানে একখান পেল্লায় জলা জমি আছে। লোকে বলে পেতনির জলা। ভূতপ্রেতের কথা ছেড়ে দিলেও, এই শীতে সন্ধের পর রোজই বাঘ বের হয়। কমলপুরের জঙ্গল থেকে বুনো কুকুরের ঝাঁকও কখনও-কখনও হানা দেয়। তারা বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

বাজারের প্রান্তে অশ্বত্থ গাছটার তলায় বাঁধানো চাতালে বসে যখন গয়ারাম সাত-পাঁচ ভাবছে, তখনই হঠাৎ টের পেল, চাতালের ওদিকটায় অন্ধকারে বসে দু'টো লোক গভীর শলাপরামর্শ করে যাচ্ছে। দু'-একবার 'গুণময় রায়' আর 'মাদলপুর' শব্দ দু'টো কানে এল। সে একটু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

একজন বলল, "শোন পচা, বুক ঠুকে কাজটা করে ফেলতে পারলে আমাদের আর চিন্তা নেই। ধর, যদি গয়না বেচে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে যাই, তা হলে দু'জনে মিলে নবাবগঞ্জে মনোহারি দোকান দেব। কথা দিচ্ছি, আর জীবনে চুরি-জোচ্চুরি করব না, এই একবারটি ছাড়া।"

"দ্যাখ গদা, আমি জীবনে কখনও ওসব করিনি, ওসব করলে ভগবান পাপ দেয়।"

"আহা, বলছি তো, এবারকার মতো পাপটা করে ফেলে একটা প্রায়শ্চিত্তির করে নিলেই হবে। ওরে, ভগবান তো পাপীদের জন্যই আসেন। তাই তো বলে



'পতিতপাবন'।"

"যদি ধরা পড়ে যাই?"

"সে ভয় নেই। বিয়েবাড়ি বলে কথা! লোকজনের যাতায়াত লেগেই আছে। ডেকরেটরের লোক, জেনারেটরের লোক, না হয় তো রান্নার জোগালি, যা হোক একটা ভেক ধরে নিলেই হবে। চার মাইল তো মোটে রাস্তা। টুক করে কাজ সেরে ফিরে আসব।"

এরা তার মাসির বাড়িতে চুরি করার মতলব আঁটছে দেখে গয়ারাম খুশিই হল। এলাকার ছেলে, সুতরাং পথঘাট চেনে, তা ছাড়া পথের সাথীও পাওয়া যাবে।

গয়ারাম একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "ভায়ারা, একটু আনাড়ি মনে হচ্ছে!"

ছোকরা দু' জন তার দিকে ফিরে চেয়ে বলল, "তুমি কে?"

গয়ারাম হাতে হাত ঘষে বলল, "দাশরথী পয়মালের নাম জানা আছে?"

পচা আর গদা তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার দু' পাশে জেঁকে বসে বলল, "না ভাই, তিনি কে?"

"এ লাইনে তিনিই শেষ কথা! অত বড় গুণী আর এ লাইনে নেই। কুঞ্জপুরের কাছে থাকেন, একেবারে সাধুসন্তের মতো জীবন! পাপের টাকা ভোগ করেন না, বিলিয়ে দেন। তাঁর ছেলেরা অবশ্য ওই কর্ম করেই খাচ্ছে।"

পচা বলল, "বটে! কিন্তু ভাই, তুমি তো এ তল্লাটের লোক নও। কী মতলবে উদয় হয়েছ?"

"আমাদের কি তল্লাট বলে কিছু আছে? পেটের ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয়। তবে দাশরথী পয়মালের চেলা তো, পেটে বিদ্যেটা আছে বলে অসুবিধে হয় না।"

গদা খুব আহ্লাদের সঙ্গে বলল, "এই তোমার মতোই একজন সঙ্গীকে আমরা খুঁজছি। আজ রাতে মাদলপুরের এক বিয়েবাড়িতে একটা বড় দাঁও আছে। শুনেছি মেলা গয়নাগাঁটি আর টাকাপয়সার ব্যাপার আছে।"

গয়ারাম খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। ভাবখানা, ছোটখাটো কাজে তার গা নেই। বলল, "তা ছেলের বিয়ে না মেয়ের বিয়ে? ছেলের বাড়িতে তো বিশেষ গয়নাগাঁটি থাকবার কথা নয়। মেয়ের বাড়ি হলেও না হয় কথা ছিল।"

পচা মাথা চুলকে বলে, "ছেলের বাড়িই বটে! তবে গুণময় রায় ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ লাখ তুলেছে, আর মদন স্যাকরাকে বিস্তর গয়নার বরাত দিয়েছে, এটা পাকা খবর।"

গয়ারাম বলল, "রাস্তা চেনা আছে? শুনেছি মাদলপুর যেতে বড় একটা জলা পড়ে!"

"ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। রাতবিরেতে আমাদের ওদিকে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়।"

গয়ারাম নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলল, যাক বাবা, চার-পাঁচ মাইল রাস্তা যে এই অন্ধকারে একা ঠ্যাঙাতে হবে না, এটাই যথেষ্ট। গয়ারাম বলে, "তা না হয় হল, কিন্তু পেটে যে ছুঁচো ডন মারছে, খালি পেটে কি আর হাত-পা সচল থাকে?"

এবার গদা বলল, "এই বাজারেই আমার পিসেমশাইয়ের পাইস হোটেল, আমিই এবেলা ম্যানেজারি করেছি। খাওয়ার ভাবনা কী?"

গয়ারাম ফের আরামের শ্বাস ছাড়ল। ভগবান একেবারে ছপ্পড় ফুঁড়ে দিচ্ছেন।

খাওয়াটা মন্দ হল না। ডাল, ভাত আর নিরামিষ তরকারি, সঙ্গে এক বাটি মাংস। চেটেপুটে খেয়ে তিনজন রওনা হয়ে পড়ল।

ভুতনির জলা মাঠ ঘোর অন্ধকার। তবে পচা আর গদা পথঘাট ভালই চেনে। ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, আঁকাবাঁকা রাস্তায় ডাঙা জমি দিয়ে দিব্যি যাচ্ছে। পিছনে গয়ারাম।

কিন্তু খানিকটা হাঁটার পরই গয়ারাম শুনতে পেল, অন্ধকারে এই নির্জন পথে তারা ঠিক একা নয়। আশপাশে যেন আরও লোকজন চলেছে এবং তাদের ফিসফাস কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে।

গয়ারাম একটু ঠাহর করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল এবং একটু বাদেই শুনতে পেল, হাত দশেক তফাতে বাঁ ধারে এক বুড়ো মানুষের কাশির শব্দ। তারপরই ঘড়ঘড়ে গলায় কেশো লোকটা কাকে যেন বলল, "বুঝলি গাব্বু, এই

কাশির জন্যই চুরি করা ছাড়তে হয়েছিল আমাকে। চোর কাশলেই সর্বনাশ। অথচ এমন দাঁওটাই কি ছাড়া যায়, বল তো!"

"আহা, তোমার ভিতরে যাওয়ার কী দরকার? তুমি বাইরে বসে কাজের লোকেদের সঙ্গে গপ্পোসপ্পো কোরো। আমি ভিতরে ঢুকে কাজ সেরে আসব। গুণময় রায়ের বাড়ির আনাচকানাচ আমার চেনা।"

গয়ারাম প্রমাদ গনল, পচা আর গদাই শুধু নয়, আরও নিশিকুটুমরাও তার মাসির বাড়ি যাচ্ছে!

কয়েক কদম এগোতে না-এগোতেই পিছন থেকে কয়েক জোড়া দৌড়-পায়ের আওয়াজ পেল গয়ারাম। তার ডান দিক দিয়ে মাত্র চার-পাঁচ হাত তফাতে গোটা কয়েক ছোকরা গোছের লোক ছুটে গেল। পিছনেরজন একটু উঁচু গলায় বলল, "মাদলপুরের শীলতাতলায় গুণময় রায়ের বাড়ি, বুঝলি তো? ভুল বাড়িতে ঢুকিস না।"

তারা ছুটতে-ছুটতে এগিয়ে গেল।

পচা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "এটা কী হচ্ছে বল তো?"

গয়ারামও অবাক। বলল, "তাই তো? এরা কারা?"

বুড়োটা পুরনো চোর কাশী, সঙ্গে ওর নাতি গাব্বু, আর যারা ছুটে গেল, তারা পোড়াগাছতলার নন্দকিশোর সংঘের ছেলে, সব ক'টা চোর।

গদা বলল, "সর্বনাশ! চল চল, পা চালিয়ে চল।"

পচা বলল, "দৌড়তে হবে, নইলে পারব না।"

তিনজনে যথেষ্ট বেগে দৌড়তে লাগল।

আশ্চর্যের বিষয়, দৌড়তে-দৌড়তে আরও তিনটে দলকে একে-একে ছাড়িয়ে গেল তারা। কিন্তু চতুর্থ দলটাকে পারল না। হঠাৎ পটাপট ল্যাং মেরে তিনজনকেই ফেলে দিল জনাদশেক চোরের একটা দল।

মুখে টর্চ মেরে একটা লোক বলল, "অ্যাই খবরদার, আমাদের টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করলে লাশ পুঁতে দেব। আমরা গিয়ে আগে চেঁছেপুঁছে নিই, তোরা পরে প্রসাদ পাবি।"

তিনজনে চিঁচিঁ করতে লাগল পড়ে থেকে।

ঘন্টা দেড়েক বাদে যখন তারা মাদলপুরে পৌঁছল, তখন তাদের দম বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা।

কিন্তু মাদলপুর পৌঁছে তাদের চক্ষু চড়কগাছ। রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। এই সময় গাঁ-গঞ্জের লোকের নিশুত রাত। কিন্তু কোথায় কী? গাঁয়ে ঢোকার মুখেই বটতলায় বেশ কয়েকটা হ্যাজাক জ্বলছে। আর সারি-সারি টেবিল-চেয়ার পেতে গাঁয়ের ছেলেছোকরারা বসে কীসের যেন টিকিট বিক্রি করছে। বিভিন্ন টেবিলের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক লোক টিকিট কাটছে। গয়ারাম অবাক হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল, "এ কীসের লাইন দাদা?"

"ওসব চোরেদের লাইন।"

"কেন, কেন, চোরের আবার লাইন কীসের?"

"আহা, গুণময়বাবুর ছেলের বিয়ে শুনে চার দিক থেকে চোরেরা হাজির হচ্ছিল যে! নানারকম ভেক ধরেই আসছিল। ধরা পড়ে পেটাইও হচ্ছিল। কিন্তু গুণময়বাবুর দয়ার শরীর তো! তাই তিনি বললেন, 'ওরে বাপু, চোরেদেরও তো করে খেতে হবে। চুরি করতে চায় তো চেষ্টা করুক না। তবে বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, তাও দেখতে হবে। তাই টিকিটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দু' টাকার টিকিট কাটলে চুরি করার জন্য এক ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। তবে চুরির সময় ধরা পড়লে পাঁচ টাকা ফাইন।'"

পচা আর গদা করুণ মুখে বলল, "আমরা কি পারব? কত বড়-বড় নামজাদা সব চোরদের দেখতে পাচ্ছি।"

গয়ারাম দমে গিয়ে বলল, "তাই তো হে!"

অগত্যা টিকিট কেটেই তারা তিনজন গাঁয়ে ঢুকল। গিয়ে দ্যাখে, গুণময়বাবুর বাড়ির সামনেও বেশ লম্বা লাইন। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। পেল্লায় বাগান, দু' মহলা বাড়ি, চার দিকে দাসদাসী, লোকলশকরের অভাব নেই।

চোরেদের সঙ্গে লাইন দিয়ে নিজের মাসির বাড়িতে ঢুকতে গয়ারামের প্রেস্টিজে লাগছিল। কিন্তু উপায় বা কী? সুতরাং পচা আর গদার পিছনে সেও লাইনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

একটা ছোকরা চোর একটা শসা, একটা পাতিলেবু চুরি করে বেরিয়ে এল। একজন আধবুড়ো লোক একটা পুরনো গামছা পেয়ে সেটা পতাকার মতো নাড়তে-নাড়তে বিদেয় হল। একজন একটা নারকেল পেয়ে সেটাকেই চুমু খেয়ে সবাইকে হাত উঁচু করে দেখাল। একজন পেয়েছে একমুঠো কাঁচা লঙ্কা, তার মুখখানা ভারী বেজার। বুড়ো চোর শশিপদ এখন চোখেও কম দ্যাখে, কানেও কম শোনে। সে একগাছা ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে এসে বিড়বিড় করতে-করতে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বাড়িমুখো রওনা হল। তবে এর মধ্যেই এক ছোকরা চোর একখানা তাঁতের শাড়ি বগলে নিয়ে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে আসতেই পচা বলল, "ওই হচ্ছে পাঁচটা গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান চোর, ফটিক।"

ঘণ্টাখানেক বাদে তাদের পালা আসতেই তিনজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বাড়ি-ঘর-দেওয়ালের মধ্যে।

সামনেই মেসোমশাই গুণময় রায়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গয়ারাম তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রণাম করল। কিন্তু গুণময়বাবু তাকে মোটেই পাত্তা না দিয়ে বললেন, "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।"

"মেসোমশাই, আমি গয়ারাম।"

"আয়ারাম গয়ারামদেরই তো দেখছি রে বাবু।"

ভাগ্য ভাল, ঠিক এই সময়েই মাসি কী একটা কাজে মেসোকে ডাকতে এসেছিলেন। গয়ারাম চেঁচিয়ে উঠল, "মাসি!"

মাসি হাঁ করে তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলেন, "মরণ! তুই এই চোরেদের দলে কেন রে মুখপোড়া? তোর চেহারাটাও তো চোর-চোর দেখাচ্ছে। আয় আয়, ঘরে আয় বাবা। মুখখানা তো একদম শুকিয়ে গিয়েছে।"

পচা আর গদা গয়ারামের কাণ্ড দেখে হাঁ। পচা বলে উঠল, "সে কী হে ভায়া, তুমি চোর নও?"

ভারী লজ্জা পেয়ে গয়ারাম আমতা-আমতা করে বলল, "ইচ্ছে যে ছিল না তা নয়। তবে এ যাত্রায় আর হয়ে উঠল না ভায়ারা। তোমরা বরং চেষ্টা দ্যাখো।"

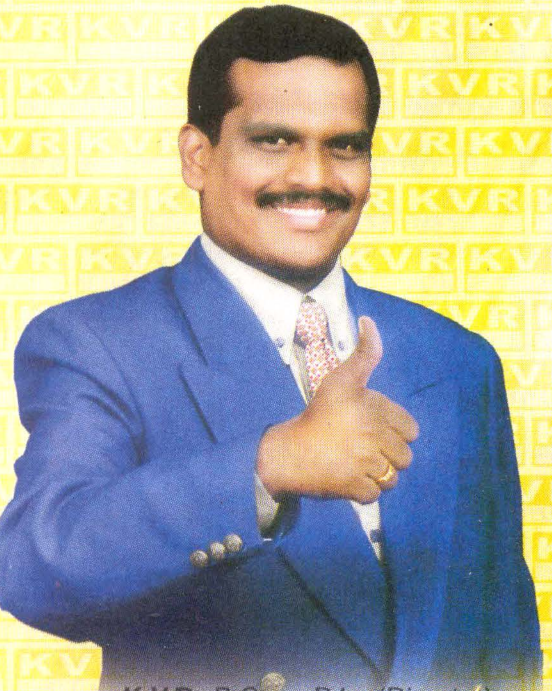
পচা আর গদা ভারী দুঃখিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। গদা বিড়বিড় করে বলল, "নেমকহারাম আর কাকে বলে!"

ছবি: দেবাশিস দেব

প্রতিদিন এক ঘন্টাই যথেষ্ট।
6 লাখেরও বেশি মানুষ লাভবান হয়েছেন।
আর আপনি ?

শুধু বাংলা জানলেই চলবে

ইংরেজি
শিখুন
সহজেই ইংরেজি বলুন



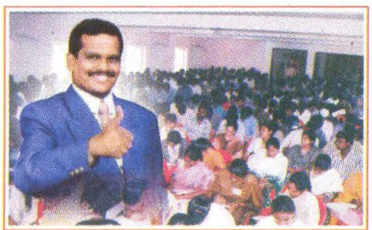
K.V.R. B.Com.,B.L., (Director)

আপনি আপনার ঘরে বসে অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই প্রতিদিন ১ ঘন্টা নিজে নিজে শিখলেই যথেষ্ট। আপনি সহজেই ইংরেজি শিখে নিতে পারবেন। আমাদের কোর্স বিশেষরূপে সোজা উদাহরণ সহযোগে সহজ ভাবে তৈরি। এই জন্য নিঃসন্দেহে আপনি ইংরেজিতে সহজেই কথা বলতে পারবেন। এই কোর্সের বর্তমান খরচ 600 টাকা। নীচের কুপন পূরণ করে আমাদের কাছে পাঠান। আপনার পোস্টম্যানের কাছে টাকা দিয়ে কোর্স নিয়ে নিন। এর পরে আর একটি কোর্স আছে যা চার মাসের কোর্স। এর খরচ অনেক কম, নামমাত্র। ইচ্ছে হলে এই কোর্স নিতে পারেন তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।

বিনামূল্যে
200/- টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স
(সহজ ইংরেজিতে)

---

6 লাখেরও বেশি মানুষের শেখা ইংরেজি কোর্স।



এক দিনের ইংরেজি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছেন কে.ভি.আর. (পুরস্কারবিজয়ী)

এই কুপন পূরণ করে পাঠান

3888

SINCE 1990

KVR INSTITUTE
AWARD WINNER

বিনামূল্যে
200/-টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স (সহজ ইংরেজিতে)

New No.203(BEN), Habibullah Road, T.Nagar, Chennai - 600 017.

আমাকে কে.ভি.আর. (1 মাসের) ইংরেজি কোর্স এবং মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স ইত্যাদি ডাকে পাঠান। আমি পোস্টম্যানকে **600/-** টাকা দিয়ে দ্রুত বই সংগ্রহ করে নেব।

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানা বড় হাতের ইংরেজি হরফে লিখুন।

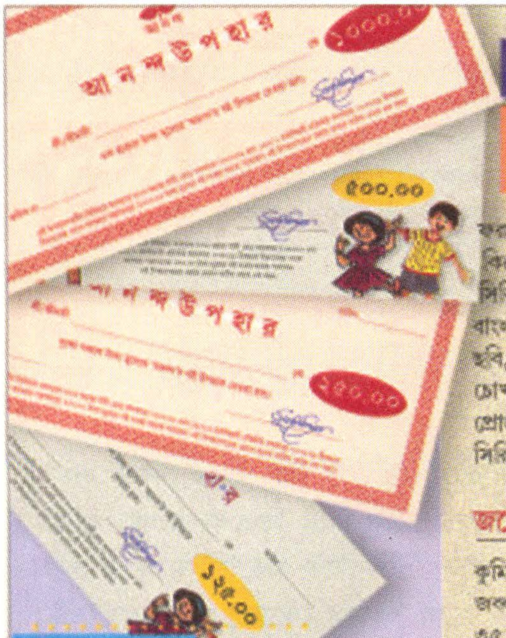
Name: ....

Address: ....

....

.... Pin Code: ☐☐☐☐☐☐

* SERVICE TAX INCLUDED

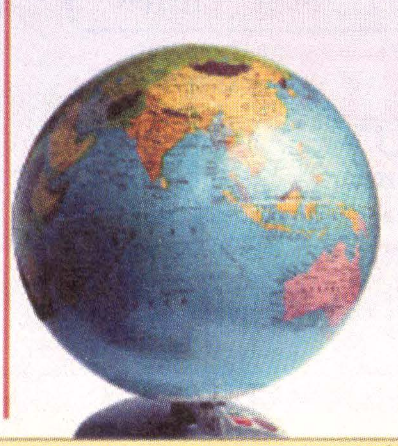


প্রিয়জনকে

আনন্দ উপহার

গিফ্‌ট কুপন

১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা, ৫০০ টাকা, ও ১,০০০ টাকা মূল্যের এই কুপনের বিনিময়ে পাবেন পছন্দের বই। কুপন কেনার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বই সংগ্রহ করতে হবে। গিফ্‌ট কুপন পাওয়া যাবে ৬৭ এ, মহাত্মা গাঁধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯-এ অবস্থিত আমাদের বিপণন কেন্দ্র থেকে।



শিশুদের উপযোগী প্রথম

পকেট এনসাইক্লোপিডিয়া

ফরাসি ভাষার এক জনপ্রিয় কিশোর-জ্ঞানবিজ্ঞান সিরিজের বই থেকে স্বচ্ছন্দ বাংলায় রূপান্তর। সুন্দর ছবি, মাপ, এমনকী চোখ-ধাঁধানো প্রোডাকশনের মানও এই সিরিজের প্রতিটি বইতে

জলে-জঙ্গলে সিরিজ

কুমির! কুমির! ৩৫.০০
অবাক সব জলের জীব ৩৫.০০
নেকড়ে ৩৫.০০
প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু ৫০.০০
বড় ভালুক ছোট ভালুক ৩৫.০০
বিপন্ন প্রাণী ৫০.০০
বুদ্ধিতে সেরা বাঁদর ৩৫.০০
বেড়ালের জাতভাই ৩৫.০০
হাতির খবর ৩৫.০০

মানুষের কীর্তিকথা সিরিজ

আলো আর রং ৩৫.০০
চাকার খেলা ৩৫.০০
টাকাকড়ির কথা ৩৫.০০
ভেসে চলা ৩৫.০০
মহাকাশের রহস্য ৩৫.০০
মাপ আর ওজন ৩৫.০০
যানবাহন ৩৫.০০
লেখালেখির গোড়ার কথা ৫০.০০
শক্তির উৎস ৫০.০০
সেতু, সুড়ঙ্গ, সৌধমালা ৫০.০০

ইতিহাস সিরিজ

আমেরিকার গোড়ার কথা ৫০.০০
ক্যাথিড্রাল ৫০.০০
পুরনো কেল্লা ৫০.০০
প্রাচীন গ্রিস ৫০.০০
প্রাচীন মিশর ৫০.০০
রাজা-রানি ৫০.০০
রেড ইন্ডিয়ান ৫০.০০
রোমের ইতিহাস ৫০.০০
হানাদার বর্বর জাতি ৫০.০০

বিশ্ব-জগৎ সিরিজ

আকাশ-বাতাস ৩৫.০০
আগ্নেয়গিরি ৩৫.০০
পাহাড়-পর্বত ৩৫.০০
সাগর থেকে মহাসাগর ৩৫.০০
সূর্যকে নিয়ে ৩৫.০০

কীটপতঙ্গ-পশুপাখি সিরিজ

আমাদের শহরে জীবজন্তু ৪০.০০
খামারবাড়ির জীবজন্তু ৪০.০০
গোরু-মোষের গল্প ৪০.০০
ঘোড়ার কাহিনী ৪০.০০
পাখির বাসা পাখির ডিম ৪০.০০
বাড়ির পোষা জীবজন্তু ৪০.০০
শুঁয়াপোকা থেকে প্রজাপতি ৪০.০০



দক্ষিণ কলকাতায় আনন্দ-র বই

১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৯, ফোন: ২৪৬৪-৬২১২

এখানে পাবেন আনন্দ-প্রকাশিত সমস্ত বই।

নিজের হাতে দেখে পছন্দ করে বই কেনার সুযোগ।

রবিবারেও খোলা থাকছে।

আ ন ন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭, ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

ফেয়ারওয়েল

সৌরভ মুখোপাধ্যায়



মার্চ মাসের একত্রিশ তারিখ আজ। সদানন্দস্যারের চাকরির শেষ দিন। বসুমতী প্রাইমারি ইশকুলও আজ শেষবার খুলবে, তারপর বন্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের মতো।

বন্ধ না হয়ে উপায় কী? আজ তিন বছর হল সদানন্দস্যারই এই ইশকুলের একমাত্র মাস্টারমশাই। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে-কমতে কুড়ি-বাইশে এসে ঠেকেছিল। ফলে আর মাস্টারমশাই পাওয়া যায়নি। এই ক'বছর সদানন্দস্যার একাই নিয়েছেন সব ক'টা ক্লাস। অবশ্য শেষদিকটায় এক-এক ক্লাসে চার-পাঁচজনের বেশি ছাত্র হত না। দোতলা ইশকুল বাড়িটায় মোট ছ'খানা ঘর। একা সদানন্দস্যার ক'টা ঘরে দৌড়োদৌড়ি করবেন? তিনি একটা ঘরেই বসতেন সকলকে নিয়ে, আলাদা-আলাদা করে পড়া দিতেন, ধরতেন। চলছিল এই ভাবেই। রোজ চাবি খোলা, ঘণ্টা দেওয়া থেকে পরীক্ষা নেওয়া, অফিসের কাগজপত্র তৈরি করা, সবই একার হাতে সামলাচ্ছিলেন সদানন্দস্যার। প্রথম-প্রথম অসুবিধে হত একটু, শেষে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

তারপর এ বছরের গোড়ার দিকে মুকুন্দপুর বস্তিটা উচ্ছেদ হয়ে গেল। বড়-বড় বুলডোজার নিয়ে মস্ত পুলিশবাহিনী এসে গুঁড়িয়ে দিল ঝুপড়িগুলোকে। গরিব মানুষগুলো বাক্স-প্যাঁটরা, হাঁড়িকুড়ি নিয়ে চোখের জল মুছতে-মুছতে চলে গেল দূরে কোথাও আস্তানা বাঁধবে বলে। সদানন্দস্যার সেদিন চুপ করে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, তাঁর ইশকুলের খুদে পড়ুয়াদের ঘরবাড়িগুলো একটার পর একটা মিশে যাচ্ছিল ধুলোয়। বাবলা, ছোটু, কমল সকলে ছলছল চোখে তাঁকে প্রণাম করে বাবা-মা-ঠাকুরমার হাত ধরে চলে গেল একে-একে। ওরা আর বসুমতী ইশকুলে আসবে না, জানতেন সদানন্দস্যার। নতুন জায়গায় নতুন কোনও ইশকুল খুঁজে নেবে। হয়তো বন্ধই হয়ে যাবে অনেকের পড়াশোনা...।

পরের দিন সকালে ইশকুল খুলে একা বসে ছিলেন সদানন্দস্যার। ভেবেছিলেন

একটিও ছাত্র আসবে না আর। কিছুক্ষণ পর গুটিগুটি পায়ে ক্লাস থ্রি'র অলকেশ বইখাতা বগলে হাজির। তার মা কাছেই একটা বাড়িতে বাসনমাজার কাজ পেয়ে গিয়েছেন। অলকেশ সকালবেলায় মা'র সঙ্গে চলে এসেছে। অন্য ইশকুলে সে পড়বে না, যত দিন বৃদ্ধ মাস্টারমশাই এখানে থাকবেন। কালো, ছোট্ট ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরেছিলেন সদানন্দস্যার। দু' ফোঁটা চোখের জল ওর মাথায় ঝরে পড়েছিল।

সেই থেকে এই ক'টা মাস সদানন্দস্যার একা অলকেশকে নিয়েই ইশকুল চালাচ্ছেন। একজন মাস্টারমশাই, একটি ছাত্র। এরকম দেউলে হয়ে যাওয়া ইশকুল নাকি আরও অনেক আছে। কাগজে খবর হয় মাঝে-মাঝে। একটার পর-একটা প্রাইমারি ইশকুল উঠে যাচ্ছে, ছাত্র মিলছে না আর। এখন ইংলিশ মিডিয়ামের দিকে ঝোঁক সকলের। ঝাঁ-চকচকে স্কুলবাস, ফটাফট ইংরেজি বলা অল্পবয়সি মিস, টাই-ইউনিফর্ম-ওয়াটার বট্‌ল আর কম্পিউটার... এ সবের পাশে দিনদিন পিছিয়ে পড়ছে মলিন, ভাঙাচোরা, দুঃখী-দুঃখী বাংলা ইশকুলগুলো। এক সময় এই বসুমতী ইশকুলেই তিনশো ছেলেমেয়ের কলকলানি শোনা যেত। পাঁচ-ছ'জন মাস্টারমশাই হিমশিম খেয়ে যেতেন ক্লাস সামলাতে। সেসব দিন যেন গল্পকথার মতো মনে হয় আজ।

দিন কয়েক আগে উপরমহল থেকে চিঠি এসেছে একটা। এই ইশকুলটাও তুলে দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রী আর মাস্টারমশাই যে বা যাঁরা আছেন, সকলকে অন্য কোনও ইশকুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সদানন্দস্যার ছুটে গিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। অনুনয় করেছিলেন, "আর তো মাত্র ক'টা দিন চাকরি আছে, শেষ দিনগুলো এখানে থেকেই কাটাতে দিন।"

মঞ্জুর হয়েছে তাঁর অনুরোধ। আজ শেষবারের মতো ইশকুল বন্ধ করে সমস্ত কাগজপত্র আর চাবি জমা দিয়ে দিতে হবে কর্তাব্যক্তিদের হাতে। কাল থেকে বসুমতী প্রাইমারি ইশকুলের আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকবে আরও কিছুদিন। তার পর কে জানে, ক' মাসের মধ্যেই হয়তো প্রোমোটারের হাতে পড়ে গুঁড়িয়ে যাবে। এর জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়বে চোখ ধাঁধানো বহুতল। আস্তে-আস্তে ভুলে যাবে সকলে। শুধু দু'-একটা খুনখুনে বৃদ্ধ হয়তো অনেক বছর পর বলবেন, "এখানে একটা ইশকুল ছিল আমাদের ছেলেবেলায়, জানো...?"

গেট দিয়ে ঢোকার মুখেই জ্বলজ্বল করছে খোদাই করা প্রতিষ্ঠার তারিখ। সেই সত্তর বছর আগেকার। এত বছর পেরিয়ে পুরনো ইশকুলটার আয়ু শেষ হল আজ। স্কুলটির মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে থাকতে হল সদানন্দস্যারকেই। বুকের ভিতরটা বড্ড ভারী হয়ে আছে সকাল থেকে।

অফিস ঘরের চাবি খুলে হাজিরা খাতায় শেষবারের মতো সই করলেন সদানন্দস্যার। সব কাগজপত্র গুনেগেঁথে গুছিয়ে নিলেন। মনের মধ্যে উথালপাথাল চলছে। তিরিশ বছর আগে এই ঘরেই প্রথম সই করতে ঢুকেছিলেন। তারপর তখনকার হেডমাস্টারমশাই অমৃত সান্যাল নিজে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিলেন ক্লাস টু'র ঘরে। প্রতি ঘরে ঠাসা ছাত্রছাত্রী তখন। সেদিন সদানন্দস্যার কি আজকের এই ছবি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন?

স্টাফরুমে মস্ত টেবিলটার পাশে একটা চেয়ারে একা বসে রইলেন সদানন্দস্যার। এক সময় কী সরগরমই না ছিল এই ঘর! মাস্টারমশাইদের হাসিতে, গল্পগুজবে গমগম করত। বেয়ারা সুরজপ্রসাদ চা বানাত টিফিনের সময়, কাগজ বিছিয়ে মুড়ি-চানাচুর মেখে সকলে মিলে খাওয়া, গ্রীষ্মের দুপুরে পাখা নাড়তে-নাড়তে একসঙ্গে পরীক্ষার খাতা দেখা, কী দিন গিয়েছে সেসব! আজ ভুতের বাড়ির মতো নিঝুমপুরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোতলা ইশকুল বিল্ডিং। খাঁ খাঁ করছে ক্লাসঘরগুলো। বেঞ্চিগুলো আগের মতোই পাতা রয়েছে, ব্ল্যাকবোর্ডগুলো ঝুলছে রংচটা দেওয়ালে। কত দিনের কত স্মৃতির ধুলো জমে আছে কোণে-কোণে! কাল থেকে আর তালাটুকুও খোলা হবে না। শেষ মাস্টারমশাইয়েরও রিটায়ারমেন্ট হয়ে যাচ্ছে আজ!

রিটায়ারমেন্ট! কথাটা যতবারই মনে পড়ছে, গলার কাছে একটা দলা আটকে যাচ্ছে যেন! এই ইশকুল থেকে কতজন মাস্টারমশাই রিটায়ার করে গিয়েছেন একে-একে। দোতলার হলঘরে সেই সব বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, তাঁদের স্মৃতি ফিকে হয়নি এখনও। ফুলের তোড়া, মানপত্র, উপহার। শেষ বক্তব্য রাখতে উঠে গলা বুজে আসা। বয়স্ক সহকর্মীদের বিদায়-শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কতবার সদানন্দস্যার। ছাত্রদের সঙ্গে রিহার্সাল দিয়ে বিদায় অনুষ্ঠানের গান গেয়েছেন কতবার, 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' কিংবা 'আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া...'

তাঁর নিজের শেষ দিনটায় কিছুই জুটল না। নিস্তব্ধ ইশকুল বাড়িতে একা বসে থেকে-থেকে, অবশেষে নিঃশব্দে চলে যেতে হবে। অলকেশ ছেলেটিও এল না আজ! অবশ্য এলেই বা কী হত! ছোট ছেলে, ও কি আর রিটায়ারমেন্ট, বিদায়-সংবর্ধনা... এত কিছু বোঝে?

একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন সদানন্দস্যার। আর বসে থেকে কী লাভ? শুধু স্মৃতির ভারে কষ্ট পাওয়া। কাগজপত্র আর চাবিটাবি গুছিয়ে নিয়ে বেরোতে যাবেন, এমন সময় দোতলা থেকে কিছু আওয়াজ ভেসে আসতে থমকে দাঁড়ালেন।

যেন বেঞ্চি কিংবা টেবিল-চেয়ার টানার শব্দ না? অনেক পায়ের ধুপধুপ?

সামনের গেটটা খোলা ছিল এতক্ষণ, কেউ ঢুকে পড়েনি তো! একটু ভয়-ভয় করছিল প্রথমটায়। শেষ পর্যন্ত সাহস করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন সদানন্দস্যার। প্রথমে দু'টো ক্লাসরুম, তারপর হলঘর। আওয়াজটা হলের দিক থেকেই এসেছে। বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়ালেন সদানন্দস্যার। তারপর মৃদু ধাক্কায় দরজা খুলে যেতেই বিস্ময়ে যেন দম বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। চোখটা দু'বার কচলে নিয়েও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না!

পরিপাটি করে টেবিল জুড়ে-জুড়ে সাজানো মঞ্চ, তার উপর সাদা কাপড় পাতা। ফুলদানিতে টাটকা রজনীগন্ধা, বাতাসে তার স্নিগ্ধ সৌরভ। বেঞ্চিতে সারিসারি কচি মুখ। এদের সকলকেই তো চেনেন সদানন্দস্যার, এই ইশকুলের পুরনো ছেলেমেয়ের দল। আর মঞ্চের চেয়ারে বসে পুরনো মাস্টারমশাইরা! কেউ রাশভারী, কেউ আগের মতোই হাসিমুখ। এ কী অসম্ভব কাণ্ড!

সদানন্দস্যারকে ঢুকতে দেখে একমাথা সাদা চুল নিয়ে পুরনো হেডমাস্টারমশাই অমৃতবাবু হইহই করে উঠলেন, "আরে



দ্যাখো, সবে ডাকতে পাঠাচ্ছি, নিজেই এসে হাজির! আমাদের আয়োজনও এই শেষ হল, দ্যাখো, চুপিচুপি সকলে মিলে কেমন চমকে দিলাম? শেষ দিনের সারপ্রাইজ, অ্যাঁ?"

সদানন্দস্যারের হতবুদ্ধি অবস্থাটা কাটছে না কিছুতেই, "আ-আপনি, মানে আপনারা... ক-কখন..."

গম্ভীর মুখটায় রহস্যের হাসি মাখিয়ে এগিয়ে এলেন প্রাক্তন পণ্ডিতমশাই গোবিন্দ ভট্চাজ, "সকলকে ডেকেডুকে আনতে একটু দেরিও হয়ে গিয়েছিল ভায়া। ভেবেছিলাম, পুরো প্ল্যানটাই মাঠে মারা গেল বুঝি! গোপন পরিকল্পনা কিনা, হেঃ হেঃ, বুঝলে তো? তা তুমি যেরকম থুম মেরে বসে রইলে ঘরের মধ্যে, শেষ অবধি অসুবিধে হল না। পা টিপেটিপে চলে এলাম সকলে। দু'-একটা পাজি অবিশ্যি খুটুরখাটুর করে ফেলেছে এক-আধবার, তুমি খেয়াল করতে পারনি।"

"এই ছেলেমেয়ে সব... এরা তো..."

"মনে রেখেছে হে, তাই তো একডাকে এসেছে। ইশকুলের শেষ দিন আজ, শেষ মাস্টারমশাইয়েরও আজ ফেয়ারওয়েল... যতজনকে পেরেছি নিয়ে এসেছি।"

বেঞ্চির পর বেঞ্চি জুড়ে ছোট্ট-ছোট্ট নিষ্পাপ মুখ। দেখতে গিয়ে চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে এল সদানন্দস্যারের। কত দিনের চেনা সব, নামধাম আলাদা করে মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। কিন্তু এত বছর ধরে এদের সঙ্গেই তো কাটিয়েছেন কত সোনার মুহূর্ত। আদর করেছেন, শাসন করেছেন, খেলা করেছেন। শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়েছেন। এরাই তো ভরিয়ে রেখেছিল তাঁর জীবনটাকে এতকাল! বুকের ভিতরটা অদ্ভুত এক তৃপ্তিতে ভরে যায় সদানন্দস্যারের।

বৃদ্ধ হেডমাস্টারমশাই অমৃত সান্যালের গুরুগম্ভীর গলা গমগমিয়ে ওঠে হলঘরে, "আজ আমাদের প্রিয় শিক্ষক শ্রীসদানন্দ মজুমদারের বিদায় সংবর্ধনা..."

তারপর যেন এক আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে কেটে গেল কতক্ষণ! পুরনো সহকর্মীরা বক্তব্য রাখলেন। হারানো দিনের স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে গলা ধরে এল অনেকের। মানপত্র পড়া হল, ফুলের তোড়া হাতে ধরে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সদানন্দস্যারও নিজের কথা বললেন কিছু। ইশকুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার দুঃখ, অন্য দিকে আজকের এই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি। এই রকম আন্তরিক বিদায়-শুভেচ্ছা যে তিনিও পাবেন, এই ইশকুল থেকেই, সে আশা অনেক দিনই ত্যাগ করেছিলেন। আজ অশেষ কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কী-ই বা জানানোর আছে তাঁর?

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে, বরাবরের মতো সমাপ্তি সঙ্গীত। বেঞ্চে বসা খুদের দল একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। রিনরিনে গলায় গেয়ে উঠল সেই ফেলে-আসা দিনের গান, যা তিনি বহুবার গাইয়েছেন, গেয়েছেন এদেরই সঙ্গে, এই ঘরে দাঁড়িয়ে, 'কে বলে 'যাও যাও', আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া...'

সম্মোহিতের মতো শুনতে-শুনতে হঠাৎ একটা সময় সদানন্দস্যারের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে উঠল যেন! সামনের ওই গোলগাল, ফরসা ছেলেটা অরূপ, অরূপ সামন্ত না! ক্লাস থ্রি'তে পড়ার সময় জলে ডুবে মারা যায়নি ও? এই হলঘরেই তো হয়েছিল ওর স্মরণসভা! বলতে উঠে চোখের জলে তাঁর সব কথা ভেসে গিয়েছিল, স্পষ্ট মনে পড়ছে! আর তার বাঁ পাশে খাড়া-খাড়া চুলের ওই দুষ্টু মুখটা, ক্লাস ওয়ানের নীলকমল সেন ছাড়া আর কে? তিন দিনের অসুখেই ফুরিয়ে গিয়েছিল ওর সব দস্যিপনা! ওই তো একদম পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে মণিমালা, পদবিটা মনে পড়ছে না, কিন্তু ইশকুলের সামনের মোড়টাতেই যে একটা খুনে লরি চাপা দিয়েছিল ওকে... আহ, সে কী রক্ত...!

গায়ের সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে যায় সদানন্দস্যারের। কাদের মাঝখানে বসে আছেন তিনি! এই যে তাঁর পাশেই বসে মিষ্টি-মিষ্টি গানে তাল দিচ্ছেন বৃদ্ধ হেডমাস্টারমশাই, এঁর নামে স্মৃতিফলক বসেছে সেই তো কত বছর আগে! এতক্ষণ সদানন্দবাবুর মনে পড়েনি একথা! টেবিলের শেষ প্রান্তে গোঁফদাড়ি ঢাকা মুখ নিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে ওই যে জগবন্ধুবাবু, উনি যে সেবার নেপাল বেড়াতে গিয়ে বাসসুদ্ধু খাদে পড়ে...

পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকেন সদানন্দস্যার। আজ এই শেষের দিনটায় মৃত্যুর ওপার থেকে কোন অলৌকিক টানে এঁরা সকলে ফিরে এসেছেন এই ইশকুলে! এ কি মায়া, বিভ্রম? অথচ মিথ্যে মনে হচ্ছে না যে এতটুকু! এই তো ঘরের বাতাস জুড়ে রজনীগন্ধার গন্ধ, চার পাশে ঘিরে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া সব প্রিয় মুখ, সুরে-বেসুরে মেশা কচি গলার কোরাস প্রতিটি দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে—

"টুটবে আগল বারে-বারে তোমার দ্বারে/ লাগবে আমায় ফিরে-ফিরে/ ফিরে-আসার হাওয়া.../ আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া..."

কী আশ্চর্য সত্যি হয়ে উঠছে গানের কথাগুলো!

"মাস্টারমশাই! ও মাস্টারমশাই!"

চমকে জেগে উঠেও বাস্তবের মাটিতে পা রাখতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল সদানন্দস্যারের। স্টাফরুমের টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন! চোখ রগড়ে তাকালেন, সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট অলকেশ। আজ সে বইখাতা আনেনি, তার হাতে একটা গাঁদাফুল।

"আজ তো তুমি চলে যাবে, মাস্টারমশাই। আমি এই ফুলটা এনেছি, নেবে?"

হাত বাড়াতে গিয়ে সদানন্দস্যারের ঠোঁট দু'টো একটু কাঁপল। চোখ দু'টো কি জ্বালা করল একটুখানি? একবার ঢোক গিলে নিয়ে ছোট্ট মাথাটায় হাত রাখলেন, চুলগুলো ঘেঁটে দিলেন অল্প। তারপর বললেন, "চল, উপরে যাবি?"

অলকেশকে কোলে করে সদানন্দস্যার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন। হলঘরের সামনে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর আলতো হাতে ঠেললেন দরজাটা। ক্যাঁ-চ করে জং-ধরা কব্জার শব্দ হল। ফাঁকা ঘরটায় আস্তে-আস্তে পা রাখলেন সদানন্দস্যার। চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চিগুলোর উপর পুরু ধুলোর আস্তর। কিন্তু হাওয়ায় খুব মৃদু একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে যেন! অবশ্য তাঁর মনের ভুলও হতে পারে।

রুমাল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে একটা বেঞ্চিতে অলকেশকে বসালেন। তারপর মেঝেতে হাঁটু গেড়ে সদানন্দস্যার বসলেন তার মুখোমুখি। বললেন, "একটা গান শেখাব, শুনে-শুনে গাইতে পারবি আমার সঙ্গে?"

অনেকখানি মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ বলল ছোট্ট অলকেশ।

ছবি: কৌস্তুভ মজুমদার



জাগ্রত অসুরের গল্প

দুলেন্দ্র ভৌমিক

পুলিশের চাকরিতে শান্তি নেই। চাকরিতে ঢোকার আগে যদি ঘুণাক্ষরেও এটা টের পেতেন, তা হলে শান্তিবাবু কখনওই এই চাকরিতে ঢুকতেন না। মুখেভাত দেওয়ার আগে বড় সাধ করে বাবা-মা নাম রেখেছিলেন শান্তিময়। কিন্তু চাকরিতে ঢোকার পর তাঁর গোটা জীবনটাই হয়ে উঠেছে অশান্তিময়। একবার ভেবেছিলেন, কোর্টে গিয়ে নামটা আইনসম্মতভাবে পালটে নেবেন। মনের এই ইচ্ছে স্ত্রীর কাছে প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন, "নাম বদলালেই কি তোমার জীবনে শান্তি আসবে?"

স্ত্রীর যুক্তিটা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তা ছাড়া শান্তিময় নিজের স্ত্রীকে মান্যও করেন। কারণ, তাঁর শ্বশুরমশাই হলেন মিলিটারির লোক। পুলিশের লোক যেমন মিলিটারির লোককে সমীহ করে, তেমনই পুলিশের বউ মিলিটারির একমাত্র মেয়ে হলে, তাঁকেও সমীহ করতে হয়। তাঁর শ্বশুরমশাই সাধারণ লোক নন। শুধু যে মিলিটারি তাই নন, মেজাজও তাঁর পেশার মতো। সেই যে কথায় বলে না, মিলিটারি মেজাজ, ঠিক তেমনই। বিয়ের সময় যখন কন্যা সম্প্রদান করছিলেন, তখনও ট্যাঁকে



নস্যির ডিবে গোঁজার মতো করে একখানা রিভলভার গোঁজা ছিল। পুরোহিতমশাই বিয়ের মন্ত্র বলছিলেন ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপা-কাঁপা গলায়। বরযাত্রীদের খাওয়ার সময় যখন আপ্যায়ন করছিলেন, তখনও তাঁর গলায় ঝুলছিল একটা বেঁটে বন্দুক। ওইরকম বেঁটে বন্দুক পুলিশি চাকরিতে তখনও শান্তিময় দেখেননি।

যখন বিয়ে করেছিলেন, তখন থানার দারোগা হননি। এখন দারোগা হয়েছেন। পদোন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে অশান্তিও বেড়েছে। চুন থেকে পান খসলেই লোকে তাঁর নামে গালাগাল দেয়। স্থানীয় পত্রিকা, টেনেটুনে পাঁচশো কপিও বিক্রি হয় না, কিন্তু সেও হয় কথায় নয় কথায় তাঁকে কাগজে-কলমে তুলোধনা করে। একটা আধা শহরে একটা-দু'টো চুরি, এক-আধটু ছিনতাই, মারদাঙ্গা এসব তো হয়েই থাকে। কোন দেশে না হয়! তাঁর এলাকাতেও হত। ওই এলাকায় বলরাম নামে একজন লোক থাকত। তার কিছু দলবল ছিল। ফলে তার চালচলনই আলাদা। শান্তিদারোগা, ওই নামেই সকলে তাঁকে জানত, বলরামও বলত 'শান্তিদারোগা'। এক দিন সন্ধেয় শান্তিদারোগার কাছে বলরামের ফোন এল। ফোনেই ধমক দিয়ে বলরাম বলল, "শান্তিবাবু, আপনি ভেবেছেন কী? আমার দলের ছেলেকে অ্যারেস্ট করেছেন?"

ফোনে বলরামের গলা শুনেই মনে-মনে কেঁপে উঠলেন শান্তিদারোগা। তিনি জানেন, বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে গঙ্গাপুরের দারোগাবাবুর গঙ্গাযাত্রা হয়ে গিয়েছে।

পরে উপরতলার পুলিশ এসে যত তদারকিই করুন, গঙ্গাপুরের দারোগা তো আর ফিরে আসেননি। অতএব তিনি যথোচিত বিনয় দেখিয়ে বললেন, "ভাই বলু, আমি তো জেনেশুনে ওকে অ্যারেস্ট করিনি। কী করে জানব বাবা, ওই গালকাটা বিল্টে তোমার লোক। তুমি এসে ওকে নিয়ে যাও। ওকে এখনও কোনও কেস দিইনি।"

বলু আসে। শান্তিদারোগার টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারে বসে। দারোগার নির্দেশ দেওয়া ছিল, তাই একজন সেপাই একখানা বড় প্লেটে দু'টো রাজভোগ, দু'খানা গরম শিঙাড়া, আর কিছু কুচো নিমকি এনে দেয়। বলরাম অর্থাৎ বলু বলল, "এসব আবার কেন!"

শান্তিদারোগা বললেন, "বেশি কিছু নয়, সামান্য একটু জলখাবার। থানার দারোগা বলে তো আর আলাদা জগতের লোক নই। আতিথেয়তা, ভদ্রতা, এসব তো আমাদেরও আছে।"

বলরাম রাজভোগ মুখে তোলে। মুখে রাজভোগ থাকায় কথা বলতে পারে না। ততক্ষণে বলুর লোক গালকাটা বিল্টে এসে গিয়েছে। বলু সামনের প্লেটটা হাতের ইশারায় বিল্টেকে দেখিয়ে, খেতে ইঙ্গিত করে। বিল্টে কোনও রকম দ্বিধা না করে প্লেট থেকে একটা রাজভোগ মুখে দিয়ে শান্তিদারোগার দিকে তাকায়।

এইরকমভাবে সকলকে খোশামোদ করে, খাতির করে শান্তিদারোগা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্য জায়গায় গুন্ডা, বদমাইশরা পুলিশকে ঘুষ দেয়। অর্থাৎ পুলিশ তাদের কাছ থেকে নাকি তোলা তোলে। কিন্তু শান্তিদারোগা তাঁর এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে উলটো পদ্ধতি নিয়েছেন। তিনি নিজেই মাসের তিন তারিখ থেকে সাত তারিখের মধ্যে পাঁচজনকে তোলা দেন। অর্থাৎ টাকা দেন। কারণ, বলরাম, হারু মণ্ডল, কানকাটা শিবে, ল্যাংড়া কানাই, টেকো কার্তিক, এই পাঁচজন হল এই গ্রামের পয়লা নম্বর গুন্ডা। খুন, ডাকাতি, ছিনতাই সবই এরা করে। শান্তিদারোগা যখন বুঝলেন, এদের প্রত্যেকেরই বড় গাছে নৌকো বাঁধা আছে এবং শান্তিদারোগার সাধ্যি নেই এদের কাউকে ধরে তাঁর থানার লকআপে দু' ঘণ্টার বেশি আটকে রাখেন। এই দু' ঘণ্টার মধ্যে ফোনাফুনি চলবে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে ফোনে যে অর্ডারটি আসবে, তা হল, ওদের ছেড়ে দিন। তার চেয়ে সরাসরি ওদের সঙ্গে রফা করে নেওয়াই ভাল। মাসে-মাসে টাকা নাও, কিন্তু আমার এলাকায় কোনও ঝামেলা কোরো না। খাল পেরোলেই তো অন্য থানার এলাকা। যা খুশি ওখানে করো। আমি বরং তোমাদের খাল পেরোবার জন্য বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দেব। জনগণ ভাববে তাদের সুবিধের জন্য হল।

এই রকম ব্যবস্থা করে শান্তিদারোগা মোটামুটি ভালই ছিলেন। কিন্তু ভাল থাকা তাঁর কপালে নেই। অশান্তি যেন কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ে না। ওই পাঁচজনের সঙ্গে রফা হওয়ার পর এই এলাকায় সবে শান্তি আসছে, ঠিক তখনই নতুন বিপদ দেখা দিল। যা ঘটল সেটা খুন, ডাকাতি, লুটপাট বা মারদাঙ্গা, এই সব শ্রেণিতে পড়ে না। এই নতুন বিপদের নাম 'অপহরণ'। হালদার পাড়ার যোগেন হালদারকে অপহরণ করা হল। ফোনে বলা হল, "তিন দিনের মধ্যে তিন লাখ টাকা না পেলে, আপনারা যোগেন হালদারের লাশ পাবেন।"

হালদার পাড়ার লোক এবং যোগেন

হালদারের স্ত্রী এসে শান্তিদারোগাকে ধরলেন। শান্তিদারোগা তো এসব ব্যাপারের কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি বাধ্য হয়ে বলরামসহ পঞ্চগুন্ডাকে খবর দিলেন, তাদের সাহায্য চাইলেন। টেকো কার্তিক, তার টাক মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, "এসব ছ্যাঁচড়ামো তো আমাদের গাঁয়ে ছিল না। হিম্মত থাকে তো খুন কর। বোম মেরে বাড়ি উড়িয়ে দে। সেসব না করে একটা বুড়োকে আটকে রেখে টাকা চাইছে! ছিঃ ছিঃ, এটাকে কি ভদ্রভাবে উপার্জন বলে?"

সবাই ভাবছিল। ভেবে যাচ্ছিল। শান্তিদারোগা বললেন, "আমি কিন্তু বাবা তোমাদের ভরসায় হালদারবাবুর বাড়ির লোককে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছি।"

বলরাম বলল, "একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। ওদের ফোনের কাছে আমি গিয়ে বসব। আপনি শুধু বলবেন, এসব আপনার প্ল্যান।"

শান্তিদারোগা আশা এবং আশঙ্কায় দুলতে-দুলতে বললেন, "কোনও অঘটন হবে না তো বাবা?"

বলরাম বলল, "না।"

বলরাম গিয়ে যখন ফোনের সামনে বসল, তখন যোগেন হালদারের স্ত্রীকে বলরাম বলল, "মাসিমা, আমি আপনাকে যা শিখিয়ে দেব, তাই বলবেন। তারপর ফোনটা আমাকে দেবেন।"

বলরাম পাশের ঘরে গিয়ে যোগেন হালদারের স্ত্রীকে বোঝাতে-বোঝাতেই একটা ফোন এল। স্ত্রী ফোন ধরলেন। চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন অপহরণকারীদের ফোন। বলরামের শেখানো মতো স্ত্রী বলতে লাগলেন, "টাকাপয়সা কিছু নেই। কিছুই দিতে পারব না। তাতে যদি ওকে খুন করে দাও, তা হলে বেঁচে যাই। রাতদিন ওই বুড়োর খিটখিটানি শুনতে আর ভাল লাগছে না। খুন করার পর লাশ পাঠাবার দরকার নেই। শুধু খবরটা দিলেই হবে। আমাকে বিধবার সাজ কিনতে হবে তো? কী বললে? ব্যবসার টাকা? সবই তো ব্যাঙ্ক থেকে ধার করা। ধার শোধ হয়নি বলে ব্যাঙ্ক সব ক্রোক করে নিচ্ছে। কোর্টের নোটিসও এসে গিয়েছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে এই নাও বাবা, ব্যাঙ্কের লোক বসে আছে। তার সঙ্গে কথা বলো।"

হালদারগিন্নি ফোনটা বলরামকে দিলেন। বলরাম ফোন ধরে বলল, "নমস্কার স্যার, শুনুন, যোগেন হালদারকে আপনারা মেরে ফেললেও আমাদের কোনও ক্ষতি নেই। কোর্ট থেকে অর্ডার বেরিয়ে গিয়েছে। উনি বেঁচেই থাকুন আর মারাই যান, তাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনাদের একটা লাভের সন্ধান দিতে পারি। আপনি মিনিটপাঁচেক পরে আমার মোবাইলে ফোন করুন। নম্বরটা হচ্ছে..."

বলরাম যখন নম্বরটা বলছিল, তখন ঘরে ঢুকলেন শান্তিদারোগা। বলরাম ফোনটা ছেড়ে দিয়ে বলল, "এইবার খেলাটা দেখুন। টেকোরা এসে গিয়েছে?"

শান্তিদারোগা বললেন, "হ্যাঁ। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।"

সকলেই অপেক্ষা করছিল বলরামের মোবাইলে কখন ফোনটা আসে। শান্তিদারোগা বললেন, "ভাই বলু, ফোনটা আসবে তো?"

বলরাম উত্তর দেওয়ার আগেই তার মোবাইলে ফোন এল। বলরাম বলল, "স্যার, তখন ফোনে কথাটা বলতে পারিনি। কারণ, আমি ছিলাম মিস্টার হালদারের স্ত্রীর সামনে। এখন? এখন আমার গাড়িতে। আপনারা তো তিন লাখ চেয়েছেন, আমি আপনাদের পাঁচ লাখ দেব, হালদারবাবুকে আমাকে দিন।"

ওদিক থেকে প্রশ্ন এল, "আপনি নিয়ে কী করবেন?"

বলরাম উত্তর দিল, "আমি বিদেশে লোক পাচার করি। হালদারবাবুর জন্য ডলারে আমি যা পাব, ভারতীয় মুদ্রায় তার মূল্য আট লাখ। শুধু-শুধু পুলিশের ঝামেলায় পড়বেন কেন? নিরাপদে বিজ়নেস করুন। বাঁ হাতে হালদারবাবুকে নেব, ডান হাতে আপনাকে পাঁচ লাখ দেব।"

ওদিক থেকে আবার একটা প্রশ্ন আসতেই বলরাম বলল, "আমি যত লোক বিদেশে পাচার করি, তাঁরা সকলেই নানা ব্যাপারে প্রশিক্ষণ পান। কিছু দিনের মধ্যেই সারা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য আমরা পালটা একটা জঙ্গি সংগঠন তৈরি করছি। হালদারবাবুর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। এটা পরীক্ষায় প্রমাণিত। মানবদেহে মোট ২০৬টি হাড় ও ৫২০টি মাংসপেশি আছে। তার মধ্যে ১৪০টি হাড়ে এবং ৩২০টি মাংস পেশিতে এমন কয়েকটি বিস্ফোরক পদার্থ বিশেষ এক ধরনের ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ঢোকানো আছে, তাতে কলকাতার মতো একটা শহরের অন্তত তিন ভাগ ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন মানুষকে খুন করতে গেলে খুনিরা শুকনো পাতার মতো জ্বলতে থাকবে। কোনও একটি জঙ্গি সংগঠনের কাছে হালদারবাবুর দাম কত জানেন? এক কোটি টাকা।"

ওদিক থেকে আবার একটা প্রশ্ন আসতেই বলরাম বলল, "সেই জঙ্গি সংগঠনের ঠিকানা আমি জানি না। আমার ঠিকানা খুব সহজ। আপনারা যেখানে আছেন তার একশো গজের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করলে তিন থেকে পাঁচ লাখ করে পাবেন। মাল জোগাবেন আপনারা, টাকা দেব আমরা।"

তারপর নিচু স্বরে কিছু কথা হল। ফোন ছেড়ে দিয়ে বলরাম বলল, "ওদের হদিশ পেয়ে গিয়েছি। আমার সঙ্গে টেকো কার্তিক যাবে। আর যা-যা করতে হবে সেটা আজ রাতেই সকলে মিলে ঠিক করে ফেলব।"

হালদারবাবুর অপহরণকারীরা সম্ভবত পেশাদার ছিল না। বলরামের কথায় রাজি হয়ে নিউ টাউনের নির্জন রাস্তায় নবাবপুরের মোড়ে একটা ভাড়া করা গাড়িতে অপেক্ষা করছিল। বলরাম আর টেকো কার্তিক গিয়ে হাজির হল সন্ধের পর। জায়গাটা নির্জন। মোড়ে একটা চায়ের দোকান ছিল, তাও বন্ধ। বলরাম গাড়ি থেকে নামতেই অপহরণকারীদের মধ্যে থেকে একজন নেমে এসে বলল, "পাঁচ লাখ এনেছেন তো?"

বলরাম বলল, "অবশ্যই। এসব কাজে কথার দামটাই আসল। হালদারবাবু কোথায়?"

ওরা উত্তর দিল, "গাড়িতে।"

বলরাম বলল, "ওঁকে গাড়ি থেকে নামতে বলুন। আমাদের গাড়িতে ওঁকে বসিয়ে দিন।"

ওরা বলল, "কিন্তু তার আগে টাকা চাই। টাকা কই?"

বলরাম বলল, "এসব কাজে ধারবাকি চলে না তা জানি। আমাদের তো সারা দেশেই এজেন্সি আছে। সেখানে অবশ্য ক্রেডিট কার্ড চলে। আপনাদের চলে কি?"



ওরা বিরক্ত গলায় বলল, "না। এখানে দাঁড়িয়ে ন্যাকামি করার সময় নেই। টাকা বের করুন।"

বলরাম তার অ্যাটাচি বের করে ডালা খুলে ব্যাগভর্তি টাকা দেখাল। সব হাজার টাকার নোটের বান্ডিল।

ওদের যে লোকটা গাড়ি থেকে নেমে কথা বলছিল, এবার তার ইশারায় হালদারবাবু গাড়ি থেকে নামলেন। টেকো কার্তিক গিয়ে হালদারবাবুকে নিয়ে নিজেদের গাড়িতে এল। হালদারবাবু বলুদের গাড়িতে উঠে যাওয়ার পরই ওদের আরও দু'জন লোক তাদের গাড়ি থেকে নেমে কর্কশ গলায় বলল, "টাকা দিন।"

বলু অ্যাটাচিটা ওদের একজনের হাতে দিয়ে বলল, "আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করলে এক বছরের মধ্যেই কোটিপতি হয়ে যাবেন। যদি রাজি থাকেন, তা হলে আপনাদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এই ডায়েরিতে লিখে দিন। এই নিন কলম।"

ওরা কাগজের প্যাড আর কলমটা নিয়ে লিখতে লাগল। বলুদের গাড়িটা হালদারবাবুকে নিয়ে ব্যাক করে একটু পিছিয়ে গেল। টেকো কার্তিক তার মোবাইলটা নিয়ে বলল, "আমাদের এজেন্টকে ফোন করি।"

টেকো কার্তিক একটু সরে গিয়ে মোবাইলে কথা বলতে-বলতে কী যে করল কে জানে, হঠাৎ করে ওদের গাড়িটা রাস্তা থেকে দু' হাত উপরে উঠে বিকট শব্দ করে নীচে আছড়ে পড়ে জ্বলতে আরম্ভ করল। বলুদের গাড়ি যখন স্টার্ট দিচ্ছে তখন ওরা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে।

বলু বলল, "ওই অ্যাটাচির সবক'টা নোট জাল। একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের সেবার জন্য শান্তিদারোগার বড় গাড়ি আসছে।"

ওরা দেখল কালো রঙের পুলিশভ্যানটা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অন্য দিক থেকে বন্দুক উঁচিয়ে আসছে একটা বড় জিপগাড়ি। ওরা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। দৌড়ে পালাবার উপায় নেই। দু' দিক থেকে পুলিশের গাড়ি ধেয়ে এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের দল লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামছে। তাদের ভারী বুটের আওয়াজে যেন বুকের পাঁজর ভেঙে যাচ্ছিল।

এই ঘটনার পর শান্তিদারোগার খুব খ্যাতি হল। সকলের মুখে-মুখেই শান্তিদারোগার জয়গান। স্বামীকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে তাঁর স্ত্রী এবং পরিবারের সকলেই খুশি। হালদার পরিবার থেকে বলুকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হল। সেই টাকা দিয়ে ওরা পাঁচজনে মিলে পিকনিক করল। অবশ্য পিকনিকের অনেক জিনিসই ওদের কিনতে হল না। মাঠে চরছিল হরি দত্তের পাঁঠা। সামনে দুর্গাপুজো, তার পরেই কালীপুজো। কালীপুজোর সময় কালো পাঁঠার খুব দর হয়। সেই ভেবেই পাঁঠাটা বড় করছিল। গালকাটা বিল্টে ওটাকে পাঁজাকোলা করে ধরে নিয়ে এল। মাছ এল ছিদামের আড়ত থেকে। বলুর কথায়, এগুলো সবই ভালবাসার দান। এই ভালবাসার দানগুলো কাউকে যেচে এসে দান করতে হল না। বলু আর টেকো কার্তিকের ছেলেরা গিয়েই দান নিয়ে এল।

শান্তিদারোগা অনেক দিন পর প্রাণ খুলে একটু হাসবার অবকাশ পেলেন। জিপগাড়ি করে যাতায়াতের সময় তিনি টের পেতেন, তাঁর দিকে অনেকেই বেশ সম্ভ্রমের চোখে তাকাচ্ছে। কিন্তু এই সুখও বেশি দিন ভোগ করতে পারলেন না। পঞ্চমীর সন্ধেয় দুঃসংবাদটি এল। এমন একটা সংবাদের জন্য শান্তিদারোগা মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। পঞ্চমীর সন্ধে সবে উত্তীর্ণ হয়েছে। রাস্তায়-রাস্তায় রং-বেরঙের আলো জ্বলছে। কোথাও বাজছে ঢাক, কোথাও বা মাইক। এমন সময় বলরাম তার ছেলেদের নিয়ে এসে উপস্থিত। বলরাম রীতিমতো উত্তেজিত। শান্তিদারোগা বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী হয়েছে বাবা বলু?"

বলরাম বলল, "সব্বোনাশ হয়ে গিয়েছে শান্তিদা।"

শান্তিদারোগা বললেন, "কেমন সব্বোনাশ?"

বলরাম বলল, "ঘণ্টাতিনেক আগে প্যান্ডেলে ঠাকুর এসেছে। জনাতিনেক ছেলে প্যান্ডেলে ডেকরেশনের কাজ করছিল। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়, আর সেই সময় দু'টো ছেলে রিভলভার দেখিয়ে আমাদের প্যান্ডেল থেকে অসুরটাকে ছিনতাই করে নিয়ে যায়।"

শান্তিদারোগা যতটা না দুঃখিত তার চেয়ে অবাক হলেন বেশি। জগৎ সংসারে কত রকমের জিনিস চুরি-ছিনতাই হয়। কিন্তু প্যান্ডেল থেকে অসুর ছিনতাই তিনি তো বটেই, তাঁর চোদ্দো পুরুষও কখনও শোনেননি। তিনি চোখ কপালে তোলার ভঙ্গি করে বললেন, "বলো কী? প্যান্ডেল থেকে অসুর ছিনতাই?"

বলুর দলের একজন ছেলে বলে উঠল, "সেই জন্যই বলেছিলাম বলুদা, একচালার ঠাকুর অর্ডার দিন। এক চালার ঠাকুর হলে অসুরটাকে ছিনতাই করতে পারত না।"

বলু বলল, "এবার চমক দেওয়ার জন্য ঠাকুরের ডিজাইন অন্য রকম করেছিলাম। অসুর তো মা'র ত্রিশূলে বিদ্ধ ছিল না। সকলেই যেমন আলাদা-আলাদা, তেমনই অসুরও আলাদা। হাতে একটা তলোয়ার নিয়ে মা'র দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। বেচারি একা ছিল, তাই তুলে নিয়ে গিয়েছে। এখন অসুর ছাড়া কেমন করে পুজো হবে?"

শান্তিদারোগা বললেন, "কুমোরটুলি গিয়ে একটা সিঙ্গল অসুরের খোঁজ করো না।"

বলু বলল, "সে কী আর করিনি ভেবেছেন! সব জায়গায় খোঁজ করেছি। কিন্তু কারও কাছে খুচরো অসুর নেই। অর্ডার দেওয়া অসুর সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এখন অসুর পাই কোথায়? আগামীকাল মহাষষ্ঠী।"

এই রকম সমস্যার কথা শান্তিদারোগা তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে কখনও শোনেননি। তিনি ভাবতে লাগলেন। যদিও ভেবে এই সমস্যার কোনও কূলকিনারা হবে না, তবুও তিনি বলুদের সামনে ভাবনার ভাব করতে লাগলেন।

এই সময় মোটরবাইকে করে টেকো কার্তিক এসে উপস্থিত। সে বলল, "বলু, আমার মনে হচ্ছে এটা ওদের দলের কাজ।"

শান্তিদারোগা বললেন, "কাদের দলের?"

টেকো কার্তিক বলল, "ওই যে, যারা হালদারবাবুকে অপহরণ করেছিল। বলু আর আমি এবার একসঙ্গে দুর্গাপুজো করছি তো! তাই আমাদের শায়েস্তা করার

জন্য বদলা নিল। আমার কালীপুজোতেও একটা কিছু করবে।"

বলু বলল, "আগে থেকে আঁচ পেলে তো ব্যবস্থা নিতাম। ব্যাটারা বদমাশ। বুড়ো, মাটির অসুর, এই সব ছিনতাই করে। সাহস থাকলে আমাকে ছিনতাই কর না?"

শান্তিদারোগা ঘনঘন টেকো কার্তিকের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এবার তিনি বললেন, "হাতে তো সময় বেশি নেই। আগামীকালই তো বোধন। রাত পোয়ালেই পুজোর ক্রিয়াকর্ম শুরু হবে। এখন পঞ্চমী থেকেই ঠাকুর দেখা শুরু হয়।"

বলু বলল, "শুরু হয় কী বলছেন, শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা তো পরদা ফেলে ঠাকুর ঢেকে রেখেছি। কিন্তু এভাবে ক'দিন ঢেকে রাখব?"

শান্তিদারোগা বললেন, "তাই বলছি কী, এই ক'টা দিনের জন্য যদি আমার প্রস্তাব মতো কাউকে, ধরো টেকো কার্তিককে অসুর সাজিয়ে কাঠামোয় বসিয়ে দাও, তা হলে কোনওমতে পুজোটা উতরে দেওয়া যায়। ওকে খারাপ মানাবে না!"

সকলেই টেকো কার্তিকের দিকে তাকাল। কিন্তু টেকো কার্তিক প্রবল আপত্তি তুলে বলল, "এসব হয় নাকি! অসুর সেজে ষষ্ঠী থেকে দশমীর সন্ধে পর্যন্ত একভাবে থাকা যায়? অসম্ভব ব্যাপার।"

শান্তিদারোগা চেয়ার থেকে উঠে এসে টেকো কার্তিকের হাতটা ধরে অনুনয় করে বললেন, "বাবা কার্তিক, তুমিই পার মায়ের পুজো রক্ষা করতে। নইলে সিঙ্গল এক পিস অসুরের জন্য পুজো বন্ধ হয়ে যাবে?"

এবার বলুর দলের ছেলেরা সকলেই বলতে লাগল। গালকাটা বিল্টে কার্তিকের পায়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বলল, "কেতোদা, তুমি আমাদের বাঁচাও। তুমি আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবে।"

বলুও এবার কার্তিকের হাত দু'টো ধরে বলল, "কেতো, এটা তো তোরও পুজো! রাজি হয়ে যা ভাই! আমার মান, পাড়ার মান, দেশের মান, এমনকী মা-দুর্গার মান রক্ষার দায়িত্বও তোর হাতে।"

কার্তিক নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "এই টাক মাথায় আমাকে অসুর মানাবে কেন?"

বলু বলল, "টাক ঢাকার ব্যবস্থা আমি করব। এমন করে দেব যে, পাবলিক তোকে চিনতেই পারবে না।"

অনেক সাধাসাধির পর কার্তিককে রাজি করানো গেল। শর্ত হল, এক ঘণ্টা পর-পর পরদা টেনে দিতে হবে। তখন কার্তিক একটু বিশ্রাম করবে।"

সেই শর্তে সকলেই রাজি। খানদশেক ছবি দেখে কার্তিক অসুরের ভঙ্গি নকল করল। মহাষষ্ঠীর দুপুরের আগেই কোঁকড়ানো চুল নিয়ে এল বলু। মাথায় পরবার আগে কার্তিক বলল, "এটা কি কিনলি নাকি?"

বলু বলল, "এখন চিৎপুরে গিয়ে রেডিমেড চুল পাওয়া কঠিন। বাজারের মধ্যে যে 'গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার', তার বড় ছেলের মাথায় এটা ছিল। ওর টাকমাথা। ওর উইগটাই নিয়ে এলাম। দিনে সত্তর টাকা ভাড়া। মহাজন টাকার জন্য লোক পাঠাচ্ছে। তাই পুজোর ক'টা দিন পরচুলা খুলে দোকানে বসলে মহাজনের লোক আর চিনতেও পারবে না, তাগাদাও করবে না।"

মহাষষ্ঠীর সন্ধে থেকেই সামনের কালো পরদা সরে গেল। দিব্যি মানিয়েছে টেকো কার্তিককে। মাথায় পরচুল, লম্বা জুলফি আর মোটা গোঁফ থাকায় কেউ আর চিনতে পারছে না। মহাষষ্ঠীর রাত কোনও মতে কাটল। সপ্তমীর দিন সকাল থেকেই প্যান্ডেলে বেশ ভিড়। প্রথমে পুরোহিত দেখলেন, মহিষাসুর দিব্যি হাত বাড়িয়ে একখানা জলভরা সন্দেশ মুখে দিল। এও কি সম্ভব? মাতৃ মন্ত্রে মা না জেগে অসুর জাগ্রত হয়ে উঠল নাকি? মনে-মনে ভীত হলেন পুরোহিত। এর একটু পরেই বাজারের চায়ের দোকানের ভুতো বলে উঠল, "এই, অসুরটা আমাকে চোখ মারছে!"

ক্রমে-ক্রমে যা প্রচার হল, তা হচ্ছে, বলুদের শক্তি সঙ্ঘের অসুর জাগ্রত হয়ে গিয়েছে। সে হাত বাড়িয়ে সন্দেশ খাচ্ছে, ভুতোকে চোখ মারছে, এমনকী দক্ষিণা ও প্রণামী বাবদ দেওয়া টাকা আর বস্ত্র তুলে নেওয়ার সময় শক্তি সঙ্ঘের অসুর হাত বাড়িয়ে পুরোহিতের কাছা ধরে টেনেছে। শুধু তাই নয়, পুরোহিতের হাত থেকে টাকাপয়সা সব কেড়ে নিয়েছে।

বলু এতে অবাক হল না। কেতোর শর্তের মধ্যে ছিল, মায়ের সামনে যা টাকাপয়সা পড়বে, সব কেতো নেবে। অসুরকে ধুতি না দিয়ে জিনসের প্যান্টপিস দিতে হবে। যেহেতু কেউ কখনও অসুর কেন, কোনও দেবতাকেই প্যান্টের পিস দেয়নি, তাই বলুর শক্তি সঙ্ঘের পুজোয় প্যান্টের পিসটা একটা প্যাকেটে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরোহিতমশাই ওটি হাতে নিতেই অসুররূপী কেতো সবেগে কেড়ে নিয়েছে।

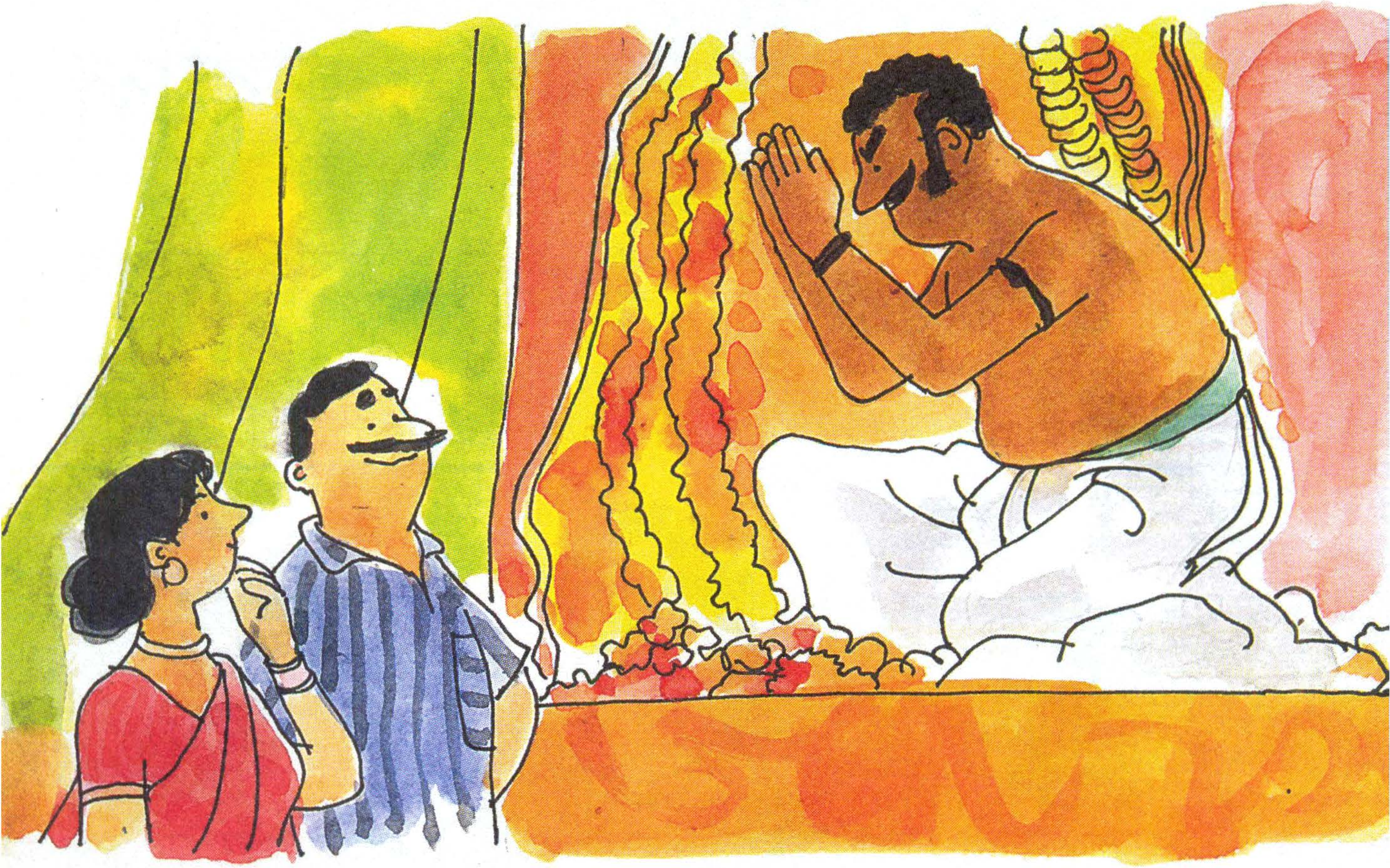
কিন্তু এসব কথা সাধারণ মানুষ জানবে কেমন করে! তারা জানল এবং প্রবলভাবে বিশ্বাসও করল যে, শক্তি সঙ্ঘের অসুর জাগ্রত হয়ে গিয়েছে। পাড়ার পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞানী বলে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা বললেন, "ঘোর কলি। এবার কলির অবসান হবে। ওদিকে গণেশ দুধ খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করছেন। সমুদ্রের জল মিঠে হয়ে যাচ্ছে এবং অসুর জাগ্রত হচ্ছে। কলির অবসান হবে মহাপ্রলয়ের মধ্যে দিয়ে।"

পাশবালিশের মতো মোটা একটা মটন রোল খেতে-খেতে প্রোমোটার রণজিৎ সরকার বলল, "মহাপ্রলয়টা ঠিক কবে থেকে শুরু হবে? আমার দু'টো বিল্ডিং এখনও হাফ ডান। কাছাকাছি সময়ের মধ্যে হলে ওটা আর কমপ্লিট করব না।"

গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডারের বড় ছেলের নাম গুরুপদ। সে রোজ দু'বার করে এসে তার উইগটা দেখে যায়। অষ্টমীর রাতে সন্ধিপুজোর সময় বিশ্রী একটা ঘটনা ঘটে গেল। পুরোহিত টের পেলেন ধূপ, চন্দন, ফুল ইত্যাদির গন্ধ ছাপিয়ে কীসের একটা উৎকট গন্ধ আসছে। পুরোহিতমশাই এদিক-ওদিক তাকালেন। পরে বললেন, "কীসের একটা গন্ধ আসছে?"

ঢাকির সঙ্গে কাঁসি বাজাতে যে ছেলেটি এসেছিল, সে জবাব দিল, "অসুর বিড়ি খাচ্ছে।"

পুরোহিতমশাই অসুরের দিকে তাকালেন। অসুরের ঘাড়টা ঘোরানো। মানে অন্য দিকে মুখ করে বিড়ি টেনে যাচ্ছে। পুরোহিতমশাই পুজো ছেড়ে উঠে আসতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। স্বয়ং অসুর তাঁকে একটা হ্যাঁচকা টানে আসনে বসিয়ে দিয়ে কড়া গলায় বলল, "কেটে পড়ছেন কেন? দশমীর আগে কেটে পড়লে আপনার লাশ গঙ্গায় ভাসবে।"



পুরোহিতমশাই কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়লেন। তিনি ভেবে পেলেন না এমন কোন মন্ত্র তিনি এখানে পাঠ করেছেন যে, অসুর জাগ্রত হয়ে উঠেছে। শুধু কি জাগ্রত? কাছা ধরে টানাটানি, হাত ধরে হ্যাঁচকা মারা, এখন আবার হুমকি। এটা কি তাঁর পুণ্যের ফল না পাপের ফল?

এরকম অঘটন একটুআধটু যে ঘটবে সেকথা বলু ও তার ছেলেরা জানত। তাই তারা খুব চিন্তিত হল না। গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডারের বড় ছেলে গুরুপদ প্যান্ডেলে এসে শুধু অসুর দ্যাখে আর বলুকে বলে, "ভাই, দশমীর দিন আমার কথাটা মনে রেখো।"

নবমীর রাতে শান্তিদারোগা সস্ত্রীক ঠাকুর দেখতে এলেন। অসুরের ব্যাপারটা তো তাঁর জানা, কিন্তু তাঁর স্ত্রী জানেন না। শান্তিদারোগাকে দেখেই অসুর হেসে উঠল। শান্তিদারোগা মনে-মনে বিব্রত হলেও অবাক হলেন না। তাঁর স্ত্রী যেই অসুরের দিকে তাকালেন, অমনি টেকো কার্তিক নিজেই একটা হাত তুলে নমস্কার করার ভঙ্গিতে কপালে ঠেকাল। দারোগার বউ বিস্ময়ে, ভয়ে অদ্ভুত এক উত্তেজনায় স্বামীর হাত জাপটে ধরে বললেন, "লোকেরা তো ঠিকই বলছে। অসুর তো জেগে উঠেছে। কিন্তু অসুর তোমাকে আর আমাকে চিনল কেমন করে?"

শান্তিদারোগা বললেন, "আমাকে তো মর্তে অসুরদের নিয়েই চলতে হয়। তাই পুরাণের অসুররাও আমাকে আর তোমাকে চেনে। স্বজাতি তো! স্বর্গে আর মর্তে তাই তফাত নেই।"

দশমীর দিন ঠাকুর যখন লরিতে উঠছে, তখন অসুর নিজেই লরির পাল্লা ধরে উঠে পড়ল। গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডারের বড় ছেলে গুরুপদ নিজের গরজেই প্রতিমা ভাসানে গঙ্গার ঘাটে এল। ওর মুখে একই কথা, "বলুদা, মনে করে কার্তিকদার মাথা থেকে আমার উইগটা খুলে নিও।"

বলু বিরক্ত হয়ে বলল, "একই কথা তো সপ্তমীর সকাল থেকে বলে যাচ্ছিস। বলছি তো, ভয় নেই।"

পুলিশ, ক্লাবের ছেলেরা এবং অন্য বারোয়ারি পুজোর লোকজন মিলে এমন তাড়া দিতে শুরু করল যে, থাকতে না পেরে বলু হাত চালাল। ব্যস, মারামারি লেগে গেল। টেকো কার্তিকের পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। হাতে ছিল টিনের পাতলা তরোয়াল। তাই নিয়ে লরির উপর থেকে শক্তি সঙ্ঘের অসুর রে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশের উপর। কাঠামো ছেড়ে অসুর পুলিশ পেটাচ্ছে, এই দৃশ্য দেখে সকলেই স্তম্ভিত। এরই মধ্যে ঠাকুর কোনও মতে ভাসান হল। টাক মাথা নিয়ে কার্তিক যখন জল থেকে উঠে এল, গুরুপদ তখন বলল, "কেতোদা, আমার চুল কোথায়?"

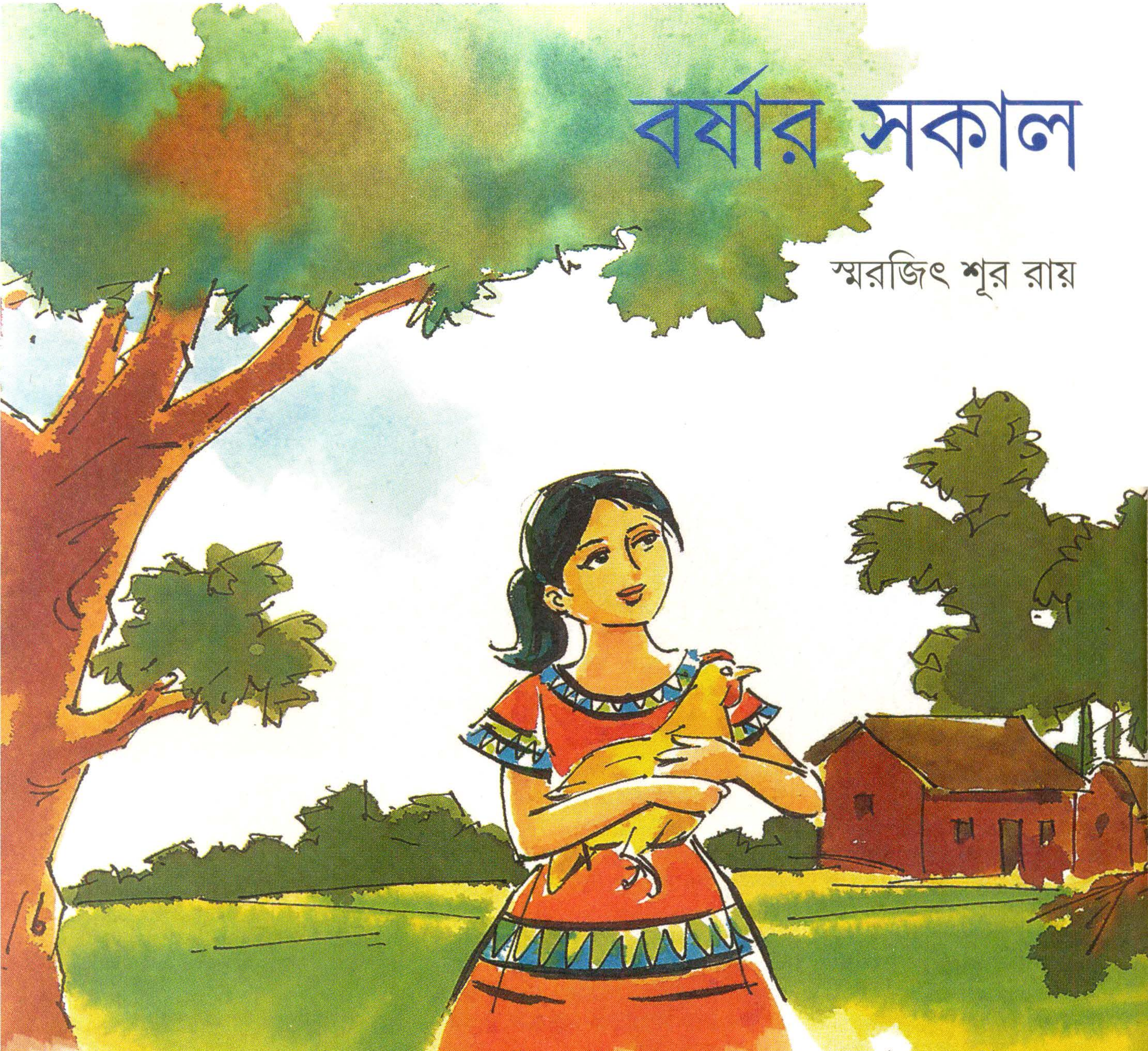
কার্তিক এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "দেখছিস মারদাঙ্গা লেগে গিয়েছে, এখন চুল কোথায় গিয়েছে কে জানে!"

পুজো মিটে গিয়েছে কবে। গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডারের বড় ছেলে চুলের জন্য থানায় 'চুল অপহরণের' ডায়েরি করলেও, রোজ গিয়ে বাবুঘাটে বসে থাকে। যদি জোয়ারের জলে তার সাধের উইগটি ভেসে আসে। এখনও সে বসেই আছে। তার প্রতীক্ষা শেষ হয়নি।

ছবি: দেবাশিস দেব

বর্ষার সকাল

স্মরজিৎ শূর রায়



দেশে নাকি বার্ড ফ্লু বলে এক ভয়ংকর রোগ এসেছে। প্রধানত মুরগির মধ্যেই এই রোগ দেখা যাচ্ছে। মুরগি থেকে ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের মধ্যে। মুরগি এবং মানুষ দুইই মারা যাচ্ছে। মানুষ তাই নিজেকে বাঁচাতে আগেভাগেই হাজার-হাজার অসহায় মুরগি মেরে ফেলছে।

আর এ খবরটা কাগজে পড়েই বর্ষা কান্নায় ভেঙে পড়ল। বর্ষা অবশ্য কাঁদলে কোনও শব্দ হয় না। কেননা, জন্ম থেকেই বর্ষা কোনও কথা বলতে পারে না। আকারে ইঙ্গিতে সব বুঝিয়ে দেয়। শুধু খুব রেগে গেলে বা কেউ যদি বর্ষার মনোমতো না চলে তখন বর্ষা অদ্ভুতভাবে উঁচু স্বরে আঁ-আঁ শব্দ করতে থাকে। ওর এই আঁ-আঁ শব্দে বাড়ির সকলে, এমনকী পাড়াপ্রতিবেশীরাও সচকিত হয়ে যান।

বর্ষার বাড়িতে আছেন শুধু বাবা ও মা। ওর বাবা সরকারি কর্মী। সরকারি কোয়ার্টারে থাকে বর্ষা। বর্ষার বয়স এখন দশ বছর। কিন্তু এখন ক্লাস টু'তে পড়ে বর্ষা। ভাল করে কথা না ফোটায় ওকে কোনও স্কুল প্রথমে নিতে চায়নি। পরে ডাক্তারবাবুরা ছাড়পত্র দিয়েছিলেন যে, বর্ষা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এক শিশু। শুধু ওর মস্তিষ্কে কথা বলানোর যে অংশটা রয়েছে, সেটা ভাল করে বেড়ে ওঠেনি বলে বর্ষা কথা বলতে পারছে না। ডাক্তারবাবুদের এই ছাড়পত্র পাওয়ার পরই বর্ষাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। বর্ষাকে এখনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কথা বলানো বা স্পিচ থেরাপি শেখানো হয়।

বর্ষাকে ডাক্তারবাবু খুব ভালবাসেন। বর্ষা তাঁদের আকারে ইঙ্গিতে বলে, সেও বড় হয়ে ডাক্তার হবে।

বর্ষা এখন পড়তে পারে। তাই বর্ষা কাগজ পড়ে বার্ড ফ্লু সম্পর্কে জানতে পেরেছে। বর্ষা খুব সুন্দর নাচতে পারে। বর্ষার নীরব চোখের দৃষ্টিতে ও মুখের ভাষায় নাচ আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। পাড়ার যে-কোনও অনুষ্ঠানে, যেমন রবীন্দ্রজয়ন্তী, বিজয়া দশমীতে বর্ষা নাচে। বর্ষার হাতের লেখাও ঝকঝকে। মনে-



মনে এক নিমেষে বর্ষা স্কুলের সব পড়া মুখস্থ করে নিতে পারে। শুধু কথা বলতে পারে না, এই যা! আর পারে অসাধারণ সুন্দর ছবি আঁকতে। এত গুণ থাকায় বর্ষাকে সকলে ভালবাসে। বর্ষাও সকলকে ভালবাসে।

বর্ষা খুব ভালবাসে পাশের কোয়ার্টারের দে-কাকিমার ছোট্ট ছেলে ঋষিকে। ঋষির বয়স এখন মাত্র চার বছর। স্কুল ছুটির পর বর্ষা ও ঋষি ওদের কোয়ার্টারের বাগানে খেলাধুলো করে। বর্ষা ঋষিকে 'ভাই' বলে ডাকে। বর্ষা শুধু এই ভাই শব্দটাই উচ্চারণ করতে পারে। তাও অর্ধেকটা, 'ভা...' বলে একটা টান দেয়। তাতেই ঋষি বুঝতে পারে দিদি স্কুল থেকে এসে গিয়ে ওকে ডাকছে। সে ডাক শুনে ঋষি পাশের কোয়ার্টার থেকে এক ছুটে চলে আসে। তারপর ভাইকে তিন চাকার মিনি রিকশার পিছনের আসনে বসিয়ে বর্ষা প্যাড্‌ল করে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঋষির যখন শরীর খারাপ হয় বা কোথাও ঘুরতে যায় তখন খেলতে আসে না। সেই সময় বর্ষার খুব কষ্ট হয়। আকারে ইঙ্গিতে সব সময় ও বাবা-মাকে বিরক্ত করে, ভাই এখনও আসছে না কেন? কবে আবার সে ভাইয়ের সঙ্গে খেলবে? ঋষি যদি খেতে না চায়, কান্নাকাটি করে। তখন বর্ষাকে ডেকে পাঠানো হয়। বর্ষা তখন নাচ দেখায়, টুক করে পেয়ারা গাছে উঠে বসে। ঋষিও খিলখিল করে হেসে ওঠে। ঋষিকে বর্ষা খুব ভালবাসে।

ঋষি ছাড়া বর্ষা ভালবাসে লালু-ভুলুকে। লালু ও ভুলু হচ্ছে বর্ষাদের বাড়ির খাঁচার মধ্যে রাখা দু'টো মুরগির নাম। বর্ষারা যে শহরে থাকে, সেখান থেকে খানিক দূরে শনি ও মঙ্গলবার হাট বসে। বর্ষার বাবা একদিন সেই হাট থেকে দু'টো মুরগি নিয়ে এসেছিলেন। তা প্রায় বছর দু'য়েক আগের কথা।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই কঁক-কঁক ডাক শুনে সোজা ওদের খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বর্ষা। কয়েক দিন ধরেই বর্ষা দেখেছে, ওর বাবা ইট দিয়ে একটার পর-একটা খাঁচা তৈরি করছেন। আর ইটের

মাথায় টিন দিয়ে ছাদ তৈরি করছেন। তখন বাবা ওকে কিছুই বলেননি। এমনকী, কখন যে হাট থেকে নিয়ে এসেছেন, তাও জানে না। সকালে কঁক-কঁক শব্দ শুনে বর্ষা তো খুশিতে ডগমগ।

বর্ষার মা ওদের নাম দিলেন লালু এবং ভুলু। মাথা নাড়িয়ে চোখ নাচিয়ে বর্ষা জানিয়ে দিল, সেও এই নাম দু'টো অনুমোদন করছে। তারপর আঙুল দেখিয়ে বলে দিল, এর নাম লালু, ওর নাম ভুলু। দু'জনেরই পালকের রং হলুদ। শুধু লালুর গলায় এবং দু'টো ডানায় অসংখ্য ছোট-ছোট কালো ফুটকি রয়েছে। ভুলুর আবার সেটা নেই। বরং ভুলুর হলদে পালকের মধ্যে একটু যেন সাদা রঙের প্রলেপ রয়েছে।

লালু-ভুলু যখন প্রথম এসেছিল, তখন ওরা ছোট্ট ছিল। বছরখানেকের মধ্যেই বড় হয়ে গেল। ওদের নিয়ে হুটোপাটি করতে-করতেই বর্ষার সময় কেটে যেত। বর্ষা ওদের দু'জনকেই নিজের কোলে বসিয়ে রাখত। ছটফট করলেই ওদের পিঠে আলতো ঘা দিয়ে বসিয়ে রাখত। ওরাও বর্ষাকে খুব ভালবাসত। বর্ষা স্কুল থেকে ফিরে এলেই ওরা কঁক-কঁক শব্দ করতে-করতে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে বর্ষাকে ঘিরে কত কিছুই না বলত। হয়তো বলত, দুপুরে খাবার পরে জল খেতে পারেনি। কিংবা বেলগাছ থেকে ওই দুষ্টু কাকগুলো ওদের খুব বিরক্ত করেছে। ওদের খাবারে ওরাও ভাগ বসিয়েছে। বর্ষা যেন সব বুঝতে পারত। ওরা তবুও ওদের ভাষায় কথা বলত। বর্ষা তাও পারত না। কিন্তু মাথা নাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ওদের সব মুশকিল আসান করে দিত বর্ষা। বর্ষার মা অবশ্য বর্ষাকে মৃদু ধমক দিতেন। বলতেন, "ওদের নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়। ওদের মধ্যে অনেক রোগ থাকতে পারে।" তাই বর্ষার হাত-পা-মুখ সাবান দিয়ে ভাল করে প্রতিবারেই ধুইয়ে দিতেন।

ঋষি অবশ্য লালু-ভুলুকে ধরতে চাইত না, ভয় পেত। কী জানি বাবা, ওরা যদি ঠুকরে দেয়! সে শুধু দূর থেকে অবাক চোখে দেখত, তার দিদি কীভাবে দু'টো দস্যিকে কোলের উপর বসিয়ে রেখেছে। এর কিছুদিন পরে, বর্ষার বাবা একটা লাল ঝুঁটি ধবধবে সাদা পালকের মোরগ নিয়ে এলেন। তা দেখে লালু-ভুলুর কী রাগ! দৌড়ে মোরগটাকে ঠোকরাতে গেল। বর্ষাও ওদের সামলাতে পারল না। সে তখন মোরগটাকে বুকে তুলে নিল, যাতে ওরা মোরগটাকে আক্রমণ করতে না পারে। ওর জন্য আলাদা খাঁচা করে দেওয়া হল।

সুন্দর সাদা ফুটফুটে মোরগটার নাম রাখা হল 'রাজ'। বর্ষার মা'র রাখা এই নাম বর্ষাও অনুমোদন করল। রাজও আস্তে-আস্তে বড় ও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। তারপর একদিন ওরা বন্ধু হয়ে গেল। আর মারামারি করত না। বরং কোথাও কোনও নতুন খাবার দেখলে রাজই লালু-ভুলুকে চিৎকার করে ডেকে নিত।

একদিন ওরা উড়তেও শিখে গেল। ঝট করে উড়ে কোয়ার্টারের পাঁচিলে উঠে পড়ত। সেখান থেকে সোজা বাড়ির বাইরে। একদিন আবার পথ হারিয়ে সন্ধে অবধি এল না। তখন বর্ষার বাবা ওদের ডানা দু'টোকে ছেঁটে ছোট করে দিলেন। ডানার লম্বা পালকগুলো ছেঁটে ছোট করে দিলে ওদের ডানায় আর শক্তি থাকবে না, ওরাও আর উড়ে পালাতে পারবে না। ডানা ছাঁটবার সময় ওরা অবশ্য ভয়ে কাঁদছিল। বর্ষারও খুব কষ্ট হচ্ছিল। মাথার চুল কাটবার সময় বর্ষার যেমন ভয় করে। এই বুঝি লম্বা কাঁচিটা মাথার মধ্যে চলে গেল! ওদের কষ্ট লাঘব করার জন্য বর্ষা সেদিন ডানা ছাঁটবার পর ওদের তিনটেকে কোলে বসিয়ে অনেকক্ষণ আদর করল।

রাজটা অবশ্য খুব চঞ্চল। কোলে স্থির হয়ে বসতেই চায় না। শুধু উঠে পড়ে। ওর দেখাদেখি লালু-ভুলুও উসখুস করতে থাকে। বিরক্ত হয়ে বর্ষা ওদের একদিন আঁ-আঁ শব্দে খুব বকতে শুরু করল। বর্ষার চিৎকারে ওর বাবা-মা, ঋষির বাবা-মা, এমনকী, পাড়ার সকলে ছুটে এলেন। কেননা, বর্ষা তো সকলের খুব প্রিয়। তাই এ পাড়ার কেউ চান না বর্ষার কোনও দিন রাগ বা অভিমান হোক। সকলে এসে দেখলেন, বর্ষা ওদের খুব বকছে, আর ঋষি ওই দূর থেকে দাঁড়িয়ে দিদিকে দেখছে। সকলে তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, "যাক বাবা, তিনটে দস্যি এবারে যদি একটু ধীরস্থির, শান্তশিষ্ট হয়ে ওঠে!"

বর্ষার বকুনিতে বোধ হয় কাজ হল। তিনটে ভয়ে দৌড়ে নিজেদের খাঁচায় ঢুকে গেল। বর্ষা তখন সকলকে হাত ও মাথা নাড়িয়ে, চোখ দিয়ে কথা বলতে লাগল, 'ওরা আসলে খুব ভাল। ইদানীং একটু ছটফটে হয়ে গিয়েছে এই যা!'

এইভাবে দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল। বর্ষাও তার নিজের জগতে ভাই ঋষি ও তিনটে দস্যিকে নিয়ে মহানন্দে ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এল বার্ড ফ্লু অসুখ। এই অসুখ নাকি খুব ছোঁয়াচে। পাখিদের থেকে সংক্রামিত হয়। যেহেতু বেশিরভাগ পাখি গাছে-গাছে ঘুরে বেড়ায়, মানুষের কাছে আসে না, তাই তাদের থেকে ভয় নেই। শুধু পোষা পাখি, যেমন মুরগি, এদের থেকেই আক্রান্ত হওয়ার বেশি আশঙ্কা। তাই দেশে-বিদেশে অসহায় পোষা পাখিদের, যেমন মুরগিদের বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলেছে।

কিছু যে একটা হয়েছে, তা বর্ষা অনুমান করছিল। ওর বাবা-মা খবরের কাগজটা নিয়ে পড়ছেন আর বারবার বর্ষা ও মুরগিদের নিয়ে নিচু স্বরে কী একটা আলোচনা করছেন। কাগজে মুরগির ছবি দেখেই বর্ষা আগ্রহী হয়েছিল। তারপর কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল। এ পাতা থেকে ও পাতা, সব কিছু তন্নতন্ন করে পড়ে ফেলল। সেখানে লেখা ছিল, 'মানুষ নিজেদের বাঁচাতে প্রায় ন' লক্ষ মুরগি মেরে ফেলেছে।'

খবরটা জেনেই বর্ষা প্রথমে ভীষণ রেগে গেল। ভয়ংকর আঁ-আঁ শব্দ করতে-করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার গায়ে। বাবার চুল টেনে মাটিতে বসিয়ে দমাদ্দম কিল মেরেই চলল। তারপর রাগ পড়ল বাড়ির বাসনকোসন ও অন্যান্য জিনিসের উপর। রাগ কমলে বর্ষা ওর মা'র কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। বর্ষার কান্নায় কোনও শব্দ হয় না, শুধু ফুঁপিয়ে ওঠে, আর ওর দু'টো সুন্দর চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়িয়ে পড়ে।

ততক্ষণে বর্ষার শব্দে বাড়িতে অনেকে চলে এসেছেন। তাঁদের আদরের বর্ষা হঠাৎ রেগে গেল কেন? এত মানুষকে বাড়িতে আসতে দেখে বর্ষা ভাবল, ওঁরা বুঝি লালু-ভুলুদের মারতে এসেছেন। বর্ষা তখন মা'র কোল থেকে এক ছুটে ওদের খাঁচার সামনে গিয়ে লালু-ভুলুদের বুকের মধ্যে তুলে নিল। কেউ যেন ওদের কেড়ে নিতে না পারে! আকারে ইঙ্গিতে



বলতে লাগল, 'ওরা ভাল, খুউব ভাল!' পাড়ার সকলে আজ হঠাৎ এ ওর মুখ চেয়ে নিচু স্বরে কী সব কথা বলতে-বলতে চলে গেলেন।

পরের দিন ওদের বাড়ির কাজের মেয়ে হারানের-মা এল না। অথচ আশপাশের কোয়ার্টারের কাজ করল। জিজ্ঞেস করতে বলে দিল, মুরগিদের থেকে নাকি কী সব রোগ হচ্ছে। তাই হারানের-মা আর বর্ষাদের বাড়িতে কাজ করবে না।

বিকেলবেলা বর্ষা স্কুল থেকে ফিরে দেখল, ওর বাবা-মা এক মনে লালু-ভুলুকে দেখছেন। বর্ষা কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, লালু-ভুলুদের চোখ থেকে কখনও কি জল গড়াতে দেখেছিস?"

বর্ষা আকারে ইঙ্গিতে বলল, 'দুঃখটুঃখ হলে ওদের চোখও ছলছল করে।' তা শুনে বর্ষার বাবা-মা নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। বর্ষার মনে পড়ল, সে কাগজে পড়েছে, এই রোগ হলে নাকি পাখিদের চোখ দিয়ে জল গড়ায়, পালক খসে পড়ে, ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ে। ওদের মধ্যে সেরকম কিছুই দেখা গেল না। ওরা দিব্যি ঘুরছে, খাচ্ছে আবার ঝগড়াও করছে।

স্কুলের ইউনিফর্ম ছেড়ে, ঋষিকে "ভা..." বলে ডাকল বর্ষা।

ঋষি এই প্রথম এল না। দে-কাকিমা বলে দিলেন, "ঋষি যাবে না।"

বর্ষার চোখ প্রথমে বড়-বড় হয়ে গেল। পরে জলে ভরে উঠল। ভাইও আজ আসবে না! ভাইও দূরে চলে গেল! সকলে ভয় পাচ্ছে! বর্ষা খানিকক্ষণ ফুঁপিয়ে নিঃশব্দে কাঁদল। তারপর আঁকার খাতাটা বের করে আঁকতে বসল। কিছু একটা আঁকতে তাকে হবেই। কিন্তু মন অশান্ত হলে কি কিছু সৃষ্টি করা যায়? কত কিছু এঁকে বলার ছিল বর্ষার। কিন্তু ঠিক মন বসাতে পারল না। খানিকটা হিজিবিজি কাটল। হঠাৎ তার মন খুশিতে ভরে উঠল।

সুন্দর করে মা সরস্বতীর ছবি আঁকল বর্ষা। আর মা'র পায়ের কাছে একটা হাঁস, দু'টো মুরগি ও একটা মোরগ আঁকল। মনে-মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হল, হাঁসও তো একটা পাখি! মা সরস্বতীর কাছ থেকে কেউ তো আর কোনও দিন তার বাহনকে কেড়ে নিতে পারবে না! হাঁসের পাশে বসে থাকলে লালু-ভুলুদেরও কেউ কেড়ে নেবে না। ছবিটা এঁকে বর্ষা তার বাবা-মাকে দেখাল। ওঁরাও খুশি হলেন।

ঠিক সেসময় পাড়ার দশ-বারোজন হঠাৎ গেটের বাইরে থেকে বর্ষার বাবাকে ডাকলেন। বর্ষা ওঁদের চেনে। পাড়ার ক্লাব থেকে এসেছেন। ওঁদের পুজোয় বর্ষা প্রতিবার নাচে। ওঁরা কী যেন বাবাকে বললেন। এত দিন ওঁরা বর্ষাকে খুব ভালবাসতেন। আজ কেন জানি না, ওঁদের হাবভাব বর্ষার ভাল লাগল না।

বর্ষার বাবা বাড়িতে এসে মা'র সঙ্গে নিচু স্বরে আলোচনা করছিলেন। বাবা ও মা'র মুখেও কেমন যেন ভয় ভাব দেখছিল বর্ষা। ভেঙে পড়ল বর্ষা। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সোজা ঠাকুরঘরে মা সরস্বতীর মূর্তির সামনে চলে গেল। বর্ষা তো আর কথা বলতে পারে না! মনে-মনে বলতে লাগল, 'মা গো, তুমি তোমার হাঁসকে যেমন রেখেছ, আমার লালু-ভুলুদেরও রক্ষা কোরো।' তারপরেই ওর এক্সারসাইজ় খাতাটা নিয়ে এসে খসখস করে গোটা গোটা সুন্দর হাতের লেখায় নিবেদন করল ওর মনের কথা, ওর প্রার্থনা। তারপর খাতাটা বন্ধ করে রেখে দিল মা সরস্বতীর সামনে। মা নিশ্চয়ই ওর কথা শুনবেন।

কয়েক দিন কাটল। বর্ষাদের বাড়িতে পাড়ার কেউ এলেন না। কথাও বললেন না। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, তাই স্কুল ছুটি ছিল। বর্ষা স্কুলেও যেতে পারেনি। কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছে না বলে বর্ষার খুব কষ্ট হচ্ছিল। বর্ষা তখন পেয়ারা গাছে উঠে পড়ল। পেয়ারা গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে কত কথাই না মনে-মনে বলল। পেয়ারার বোধ হয় দুঃখ হল। সে বলে দিল পাশের জামগাছকে। জাম বলল, আম ও কাঁঠালকে। গাছেরা সকলে তখন পাতা দুলিয়ে বর্ষাকে মন খারাপ করতে বারণ করল। বর্ষাও শান্ত হয়ে গাছ থেকে নেমে এল।

সেদিন রাতে বর্ষা ঘুমোচ্ছিল। ও জানে না, ওর বাবাকে পাড়ার সকলে আজ রাতের মধ্যে মুরগিগুলোকে বিদেয় করতে বলে দিয়েছেন। নইলে এ পাড়ায় ওদের আর থাকতে দেবেন না। বর্ষার বাবা তাই একটা বড় বস্তা এনেছেন। লালু-ভুলুদের রাতের অন্ধকারে বস্তায় ঢুকিয়ে রাতারাতি অন্য কোথাও রেখে আসবেন। একটা হ্যাচারির সঙ্গে কথা বলে আসা হয়েছে। তারা লালু-ভুলুদের রক্ত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু বর্ষার বাবা ও মা'র শুধু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, কাল সকালে বর্ষাকে কী বলা হবে? ওদের খাঁচায় দেখতে না পেলে বর্ষা কী করবে!

বর্ষা কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। সে জানে হাঁসের মতো তার লালু-ভুলুরাও রক্ষা পাবে। বর্ষার ঘরে দরজা-জানলা বন্ধ করে দেওয়া হল। যাতে বস্তায় ঢোকানোর সময় মুরগিদের সামান্যতম শব্দও যেন বর্ষার কানে না যায়! তা হলে বর্ষা জেগে যাবে।

খানিক পরেই বেরোতে হবে। রাত তখন প্রায় দশটা কুড়ি-পঁচিশ। বেরোবার আগে টিভি দেখছিলেন বর্ষার বাবা। খবর হচ্ছিল। টিভিতে সংবাদ ঘোষিকা হঠাৎ বললেন, 'সরকার বলছেন, বার্ড ফ্লু কমে গিয়েছে। ভয়ও আর নেই। দেশ এখন প্রায় বিপন্মুক্ত।'

আনন্দে চিৎকার করতে গিয়েও থমকে গেলেন বার্ষার বাবা। যদি বর্ষার ঘুম ভেঙে যায়! ওর বন্ধ ঘরের দরজায় টোকা দিতেই বর্ষার মা খুলে দিলেন। টিভির খবরটা জানাতেই আনন্দে ভরে গেল তাঁর মুখ। বর্ষার বাবাকে দাঁড়াতে বলে চুপিচুপি মা সরস্বতীর সামনে থেকে নিয়ে এলেন সেই এক্সারসাইজ় খাতাটা। খুলে দেখালেন, কী লিখেছে বর্ষা।

সে বিদ্যার দেবীর কাছে বর চায়, বর্ষা বড় হয়ে বিজ্ঞানী হবে। এমন ওষুধ সে আবিষ্কার করবে, যাতে আর কোনও দিন এই অসুখ না হয়। মানুষও অসহায় পাখিদের আর মারবে না। পাখি আর মানুষ এক সঙ্গে মিলেমিশে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

কোল বালিশটাকে দু' হাতে বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে ছিল বর্ষা। যেন দু' হাতে ওর প্রিয় মুরগিদের আগলে রেখেছে। বর্ষা জানতেই পারল না, এখন ওর বাবা ও মা ওকে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছেন।

আর বর্ষার বাবা-মাও জানতে পারলেন না, ঠিক এ সময়েই খাঁচার মধ্যে লালু-ভুলুদের ডিম ফুটে ছ' সাতটা ছোট্ট মুরগি বেরিয়ে এসেছে।

কালকের সকাল বর্ষার জন্য অনাবিল আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য



কাকাতুয়া ডট কম

প্রচেত গুপ্ত

টিক্‌লুর মেজোমামা একেবারে ভেঙে পড়েছেন। ভেঙে পড়বারই কথা। তেইশ দিন হতে চলল, ঝুঁটি একটা কথাও বলেনি। আর বলবে বলে মনেও হচ্ছে না। প্রথম-প্রথম কথা শেখানোর সময় সে মুখ তুলে তাকাত। আজকাল হাই তোলা ধরনের অপমানজনক একটা ভঙ্গি করছে। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

একেবারে শুরুতে মেজোমামা ভেবেছিলেন, পরিবেশ নতুন। মানিয়ে নিতে সময় লাগছে। কিছু দিন যাক, ঠিক হয়ে যাবে।

কিছু দিন গেল, কিন্তু কিছুই ঠিক হল না। মুখে শুধু 'ট্যাঁ', 'খক্', 'ফস' ধরনের আবোল তাবোল আওয়াজ! মেজোমামা এবার ভাবলেন, শরীরটরির খারাপ। দেখা গেল তাও নয়। সবই চলছে ঠিকঠাক। দু' বেলা পেটপুরে খাওয়া, সকালে বিকেলে ফল। দুপুরে ঠান্ডা-গরম জলে স্নান। ভোরে দাঁড়ে বসে ডিগবাজি খেয়ে আর ডানা ঝাপটিয়ে হাল্‌কা ব্যায়াম। তা হলে?

তা হলে কী, সেটাই বুঝতে পারছেন না মেজোমামা। রাগে, দুঃখে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। বাড়িতে কাকাতুয়া আছে, কিন্তু সে কথা বলে না। এর চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে?

টিক্‌লুর মেজোমামিমা বললেন, "শিক্ষা হল তো? তখনই আপত্তি করেছিলাম।"

কথাটা ঠিক, বাড়িতে কাকাতুয়া রাখার ব্যাপারে মেজোমামিমার গোড়া থেকেই আপত্তি ছিল। তিনি ঠান্ডা মাথায় টিক্‌লুর মেজোমামাকে কথাটা বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আগেকার দিনে বড়-বড় বাড়ি ছিল। ছিল বড়-বড় ঘর। লম্বা-লম্বা বারান্দা। বিশাল উঠোন। আর ছাদগুলো চওড়ায় এমন হত যে, মাঠের বদলে অনেক সময় পাড়ার ছোটখাটো ফুটবল ম্যাচ ছাদেই হয়ে যেত। তখন বাড়িতে খানকতক পশুপাখি পুষলে কোনও



অসুবিধেই ছিল না। তখন এক-একটা বাড়িতে দশ-বারোটা বিড়াল কোনও ঘটনাই নয়। দুপুরবেলা বারান্দায় লাইন দিয়ে, লেজ গুটিয়ে বসে তারা মাছের কাঁটা খেত। আজকাল বড় বাড়ির ব্যাপারটাই উঠে গিয়েছে। এখন হল ফ্ল্যাট সিস্টেম। ফ্ল্যাটে সব কিছু হয় মাপমতো। খাট, চেয়ার, টেবিল, কম্পিউটার থেকে শুরু করে ফুলদানি, অ্যাকোয়ারিয়াম, এমনকী, মানুষের পর্যন্ত আগে থেকে মাপ নিয়ে, নকশা এঁকে সব ঠিক করা থাকে। সেখানে দুম করে জীবজন্তু ঢোকানো চলে না। তা ছাড়া পাখিটাখি পোষার হবি আজকাল উঠে যেতে বসেছে। এমনকী, ছোটরা পর্যন্ত আসল জীবজন্তুর বদলে আজকাল জীবজন্তুর রোবট পোষে। এত বড় একটা মানুষ পাখি পুষেছে শুনলে সকলেই হাসবে।

এত আপত্তির একটাও টিকল না। কাকাতুয়া আনা ফাইনাল হয়ে গেল। মামিমা তখন মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন। শেষ অস্ত্র। মামাকে হুমকি দিলেন। বললেন, "তা হলে, তুমি বেছে নাও, এই ফ্ল্যাটে কে থাকবে? আমি, না তোমার কাকাতুয়া?"

মামিমা আশা করেছিলেন, এই হুমকি শুনে মেজোমামা দুঃখ-দুঃখ গলায় বলবেন, 'এটা তুমি কী বলছ! সামান্য একটা পাখির জন্য তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে? না, না, এ কখনও হতে পারে না। থাক, কাকাতুয়া পুষে কাজ নেই। এত বছর যখন কাকাতুয়া ছাড়া থাকতে পেরেছি, বাকি দিনগুলোও পারব।'

আশ্চর্যের বিষয়, হুমকি শোনার পর মেজোমামা সেরকম কিছু বললেন না! উলটে মুচকি হেসে বললেন, "কথাটা খারাপ বলোনি। ক'টা দিন বোনের বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পার। বলো তো, আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। আর সেই ক'টা দিন আমি না হয় পাখিটাকে ট্রেনিং দেব। ফাঁকা বাড়িতে ট্রেনিং দেওয়া সুবিধে।"

মামিমা বুঝতে পারলেন, এই মানুষকে আর কিছু বলে লাভ নেই।

আসলে টিকলুর মেজোমামার কাকাতুয়ার শখ সেই ছেলেবেলা থেকে। স্কুলে পড়ার সময় ভোম্বলের পিসির বাড়িতে একবার দেখেছিলেন। সেই পাখি মেজোমামাকে দেখে ঘাড় কাত করে বলল, "অ্যাই ছেলে, হোমটাস্ক হয়েছে? হোমটাস্ক না করে খেলে বেড়াচ্ছ যে বড়?"

কাকাতুয়াটার কথার মধ্যে একটা ধমক-ধমক ব্যাপার থাকলেও মেজোমামা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তখনই ঠিক করেছিলেন, তিনিও একটা কাকাতুয়া পুষবেন।

বাবার বকুনিতে সেই শখ তখন মেটেনি। এত বছর পর মেটালেন।

পাখি যেদিন বাড়িতে এল সেদিন মেজোমামিমা সত্যি-সত্যি বোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তবে বাড়ি ছেড়ে যাননি, গিয়েছিলেন রান্না শিখতে। তিনি মাঝেমধ্যে বোনের কাছে রান্না শিখতে যান। এক-একদিন এক-এক রকম রান্না। সেদিন শিখলেন চকোলেট কেক। এতে একটু সময় লাগে। কেক ফ্রিজে ঢুকিয়ে ঠান্ডা করার ব্যাপার আছে। তাই বাড়ি ফিরতে দেরি হয় গেল। পাখি আসার কথা তিনি জানতেন না। বেল টিপতে দরজা খুলল কাজের মেয়ে বুনি। একগাল হেসে বলল, "বউদি, এসে গিয়েছে।"

মেজোমামিমা অবাক হয়ে বললেন, "এসে গিয়েছে! কে এসে গিয়েছে?"

বুনি বড় করে হেসে বলল, "ঝুঁটিপিসি। ঝুঁটিপিসি এসে গিয়েছে।"

মেজোমামিমা অবাক হলেন, ঝুঁটিপিসি! ঝুঁটিপিসি কে? ঝুঁটি নামে

টিক্‌লুর মেজোমামার কোনও বোন আছে বলে তো তাঁর মনে পড়ছে না!

তিনি ভুরু কুঁচকে ঘরে ঢুকলেন এবং ঢুকেই চমকে উঠলেন!

বসার ঘরের ঠিক মাঝখানে বদ্‌খতভাবে একটা দড়ি টাঙানো। সেই দড়িতে ঝুলছে পিতলের দাঁড়। আর দাঁড়ে বসে আছে কাকাতুয়া! ঝলমল করছে। গায়ের রং ধবধবে সাদা। সেই সাদার মধ্যে একটা গোলাপি আভা যেন লুকোচুরি খেলছে! তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর তার চেয়েও চোখ জুড়নো হল মাথার ঝুঁটি! একেবারে লাল টকটক করছে যে! সেই ঝুঁটি এতই সুন্দর যে, একবার দেখলে মন ভরে না। মনে হয়, আরও একবার দেখি।

টিক্‌লুর মেজোমামিমারও তাই মনে হল। তবু তিনি মনকে শক্ত করে মুখ ফেরালেন। দুর্বলতা দেখানো উচিত নয়।

মামিমাকে দেখে খানিকটা নার্ভাস হয়েই মেজোমামা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন, "ভেবেছিলাম দু' দিন দেরি করব। মনে হচ্ছে, করলে বড় একটা বোকামি হয়ে যেত। এত ভাল পাখিটা হাতছাড়া হয়ে যেত। ঠিক যেমন খুঁজছিলাম। এ হল তোমার মাল্লাকান কাকাতুয়া। ভারী ভদ্র আর বুদ্ধিমান। তার চেয়েও বড় কথা হল, কথা বলায় একেবারে মাস্টার। কথা একবার শুরু হলেই হল। চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। তখন থামার জন্যে হাতে-পায়ে ধরতে হবে। হা হা। আনতে-আনতে একটা নামও ঠিক করে ফেলেছি। ডাকনাম অবশ্য। ভাল নাম তোমার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করব। ডাকনামটা শুনবে?"

মেজোমামিমা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। মানুষটা পাগল হয়ে গেলেন নাকি? মনে হচ্ছে তাই। মানুষের ডাকনাম হয়, পাখির কখনও ডাকনাম হয়! তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "না, আমি শুনব না। ভাল নাম, ডাকনাম কোনও কিছুই শুনতে চাই না।"

মেজোমামা গদগদ গলায় বললেন, "আহা, শোনোই না। ডাকনাম দিয়েছি 'ঝুঁটি'।"

মেজোমামিমা চোখ পাকিয়ে বুনির দিকে তাকালেন। ও, এই কারণে বিচ্ছু মেয়েটা বলছিল, 'ঝুঁটিপিসি এসেছে!'

মেজোমামা গর্বিত হেসে বললেন, "তুমি যতই রাগ করো, ঝুঁটিকে দেখতে কিন্তু ভারী সুন্দর। তাই না?"

মামিমা নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ তাই। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগারও দেখতে সুন্দর। তার মানে এই নয় যে, তাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে এবং সোফায় বসিয়ে চা খেতে-খেতে গল্প করতে হবে।"

মেজোমামা বললেন, "আহা, তুমি তো এখন শুধু এর রূপটুকুই দেখেছ, এর গুণের পরিচয় তো এখনও পাওনি। আমি যেরকম ভেবেছি, তার আদ্দেকটাও যদি পাখিটাকে শেখাতে পারি, তা হলেই সকলে একেবারে চমকে যাবে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। টিক্‌লুর মেজোমামা ঝুঁটিকে নিয়ে যা পরিকল্পনা করেছিলেন তা ভীষণ মারাত্মক। গুরুত্ব অনুযায়ী পরিকল্পনাগুলো সাজালে এরকম হবে—

পরিকল্পনা: এক) মোট আড়াইশো টেলিফোন নম্বর মুখস্থ। এর মধ্যে দেড়শো ল্যান্ড ফোনের, বাকি একশো মোবাইল ফোনের নম্বর।

পরিকল্পনা: দুই) বাজারদর থেকে আবহাওয়ার খবর, খেলাধুলার উপর দু'-একটা ভাষণ তৈরি করে শিখিয়ে রাখা হবে। বড় কিছু নয়। দশ-বারো লাইনের ছোট-ছোট ভাষণ। এর ফলে হঠাৎ বাড়িতে কোনও অতিথি চলে এলে, তাঁর সঙ্গে অন্তত কিছুক্ষণ কথা চালাতে পারবে। এই যেমন, আলুর দাম, পৃথিবীতে গরম কেন বাড়ছে, মোহনবাগানের টিম বদল, এই সব। ট্রেনিং এমনভাবে হবে, যাতে ভাষণের মাঝখানে সে ঘাড় বেঁকিয়ে অতিথিকে জিজ্ঞেস করে, "চা খাবেন? না, কফি?"

পরিকল্পনা: তিন) রোজ সকালে খবরের কাগজ দেখে সেদিনের টিভি প্রোগ্রামের কয়েকটা কানের কাছে আওড়ে দিতে হবে। ক'টার সময় কোন চ্যানেলে টেনিস, কোন চ্যানেলে ক্রিকেট, কেন চ্যানেলে সিনেমা। সন্ধেবেলা জিজ্ঞেস করলেই বলে যাবে গড়গড় করে।

পরিকল্পনা: চার) পরিকল্পনা আছে, কুইজের একটা ট্রেনিং দিতে। এটা একেবারে টিক্‌লুর জন্য ভেবেছেন মেজোমামা। টিক্‌লু আর তার বন্ধুরা এলে ঝুঁটি হবে কুইজ় মিস। কোনও সন্দেহ নেই, ব্যাপারটা দারুণ মজার হবে। তবে সমস্যা একটা আছে। প্রশ্নের জায়গায় আগে উত্তরগুলো যদি বলে ফ্যালে।!

পরিকল্পনা: পাঁচ) কুইজের পরিকল্পনা যেমন টিক্‌লুর জন্য, তেমনই এই পরিকল্পনাটা হয়েছে মেজোমামিমার কথা ভেবে। এর জন্য ঝুঁটির ট্রেনিং হবে গোপনে। মেজোমামিমা যখন বাড়িতে থাকবেন না, সেই সময়। কয়েকটি রান্নার বই আনা হবে। সেখান থেকে বাছাই করে রেসিপি মুখস্থ করানো হবে ঝুঁটিকে। রবিবার সকালে মেজোমামিমা যখন রান্নাঘরে ঢুকবেন, বাইরে দাঁড়ে বসে ঝুঁটি বলবে, 'এবার তিন চামচ চিনি দাও। তারপর এক বাটি দুধ। একটা ডিম ফাটিয়ে...।'

পরের দিন ভোর থেকেই ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল। মেজোমামা তিন দিনের ছুটি নিয়েছেন অফিস থেকে। পাখি যার কাছ থেকে আনা হয়েছে, সে বলে দিয়েছে, "শুরুটা ধীরেসুস্থে হওয়াই ভাল। একটু-একটু করে। দেখবেন, প্রথমেই যেন ঘাবড়ে না যায়। সহজ-সরল কথা শেখাবেন।"

সেইমতো প্রথম ট্রেনিংয়ের কথাটা সহজ-সরলই বাছলেন মেজোমামা। কথাটা এরকম, 'আহা! রান্না বড় খাসা!'

মেজোমামার ইচ্ছে ছিল, মামিমাকে পাখির প্রথম বুলি হিসেবে এটাই শোনাবেন। কাকাতুয়ার মুখে রান্নার প্রশংসা শুনে মামিমার রাগ একেবারে জল হয়ে যাবে।

কিন্তু ইচ্ছে ইচ্ছেই রয়ে গেল। এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা করে গোটা দিনটাই চলে গেল। ঝুঁটি চুপ করে রইল! একেবারে যাকে বলে স্পিকটি নয়! দুপুরে ছোলা সেদ্ধ, পেঁপে, আধখানা কলা দিয়ে লাঞ্চ সেরে ঢেকুর তোলা ধরনের একটা ভঙ্গি করল। তারপর ঘাড় কাত করে ঘুমিয়ে পড়ল।

মেজোমামা খাঁচার সামনে টুল পেতে বিকেল পর্যন্ত বিড়বিড় করলেন, "আহা! রান্না বড় খাসা। আহা! রান্না..."

বুনি আড়াল থেকে ঘটনা দেখে ঘাবড়ে গেল প্রচণ্ড। রান্নাঘরে গিয়ে বড়-বড় চোখ করে মামিমাকে বলল, "দাদার মনে হয় মাথা গরম হয়েছে। জল ঢালা দরকার বউদি।"



সত্যি-সত্যি মাথা গরম হওয়ার কথা। কিন্তু মেজোমামা মাথা ঠান্ডা রেখে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিন দিন গেল। চার দিন গেল। একটা গোটা সপ্তাহ চলে গেল।

ঝুঁটি মুখ ফুটে একটি কথাও বলল না!

মেজোমামা অফিসের ছুটি বাড়িয়ে নিলেন। ট্রেনিংয়ের সময় বাড়ল। গোটা বাক্যের বদলে 'হ্যালো', 'গুড মর্নিং' 'টা টা' ধরনের কথা দিয়ে চেষ্টা চলল ক'দিন। তাতেও কিছু হল না।

মেজোমামিমা বললেন, "এবার তুমি থামবে? একই কথা বলতে-বলতে হয় তুমি পাগল হয়ে যাবে, নয়তো শুনতে-শুনতে আমি পাগল হয়ে যাব। কেন বুঝতে পারছ না তুমি বিরাট ঠকেছ। লোকটা তোমাকে একটা অতি গবেট এবং মুর্খ কাকাতুয়া গছিয়ে দিয়েছে। অনেক হয়েছে, এবার চুপ করো। এর মধ্যেই বুনির অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। দেখছি, মেয়েটা সারা দিন নিজের মনে বিড়বিড় করে, 'গুড মর্নিং' 'হ্যালো' 'টা-টা'। 'গুড মর্নিং...' এর পর তো আমিও শুরু করব।"

ঝুঁটি আসার ঠিক বাইশ দিনের মাথায় মেজোমামা রাতে একটা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখলেন। ঝুঁটির মুর্খামি নিয়ে স্বপ্ন! স্বপ্নটা এরকম—দাঁড়ে মাথা নামিয়ে ঝুঁটি বসে আছে। তার ঠোঁটে ধরা এক চিলতে কাগজ। বুনি হাত বাড়িয়ে সেই কাগজের টুকরোটা নিল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'বউদি, শিগগিরই এসো, ঝুঁটির পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে! ঝুঁটির পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে!'

মেজোমামা তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরো কেড়ে নিলেন। আরে, সত্যি তো! পরীক্ষার রেজাল্টই তো বটে! একটা বিষয়েও পাশ করেনি ঝুঁটি! সব বিষয়ে লাল কালির দাগ। সবচেয়ে বেশি নম্বর যা পেয়েছে, তা হল একশোর মধ্যে সাত!

মামা ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে ঘাম মুছলেন। নিজের মনেই বললেন, "কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর!"

অফিস যাওয়ার পথেই মামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। অনেক হয়েছে, আর নয়। পাখি ফেরত যাবে। যার কাছ থেকে এনেছিলেন, ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন তাকে। কালই দিয়ে আসবেন। কথাটা ঠিকই। আজকালকার দিনে পাখি পোষা মানায় না। ছেলেবেলার সাধ মিটল না বলে মেজোমামার মনটা বেশ খারাপ হল বটে, তবে অফিসের কাজের চাপে এক সময় ভুলেও গেলেন।

মনে পড়ল সেই বাড়ি ফেরার পর।

মামিমা চা দিতে এসে অবাক হয়ে বললেন, "কী হল তোমার? ঝুঁটিকে কথা শেখাবে না?"

মেজোমামা ভাবলেন, পাখি ফেরতের সিদ্ধান্তটা ঘোষণা করে ফেলা যাক। তারপর ভাবলেন, থাকুক। চুপিচুপি নিয়ে এসেছিলেন, কাল ফেরতও দিয়ে আসবেন চুপিচুপি। মুখে বললেন, "আজ একটুও সময় নেই। ক'দিন ছুটি নিয়ে মুশকিল হয়ে গিয়েছে। অফিসে কাজ জমে গিয়েছে। বাড়িতেও ফাইল নিয়ে এসেছি। রাত পর্যন্ত কম্পিউটারে কাজ করব। এখন আর বিরক্ত কোরো না। বুনিকে বলো, ঝুঁটিকে যেন আজ রাতে ও-ই খেতে দিয়ে দেয়।"

সত্যি-সত্যি টেবিলে ফাইল ছড়িয়ে কাজে বসে গেলেন মেজোমামা। বাড়িতে ঝুঁটিকে আনার পর কম্পিউটারে হাত দেওয়ার সময়ই পাননি। ধুলো ঝেড়ে কম্পিউটার চালু করলেন।

একটু দূরে দাঁড়ে দোল খেতে-খেতে ঝুঁটি কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে আছে। মনিটরের আবছা নীল আলোয় তার চোখ দু'টো যেন জ্বলজ্বল করছে।

মেজোমামা ফিসফিস করে বললেন, "একবার ওঠো। শিগগিরই ওঠো একবার।"

মেজোমামিমা ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ক'টা বাজে? এত রাতে কী হল আবার! বিপদআপদ কিছু?

মেজোমামা ফিসফিস করে বললেন, "সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! ওই ঘরে গিয়ে একবার দেখবে চলো, কী হয়েছে। খটখট আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে পাশের ঘরে গেলাম। গিয়ে যা দেখলাম, তা মারাত্মক। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, যা দেখলাম সেটা সত্যি নয়, আমার চোখের ভুল। তাই তোমাকে ডাকলাম।"

মেজোমামিমা দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত একটা। না, পাখি-পাখি করে মানুষটার মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে।

ঘুম-ঘুম চোখে তিনি পাশের ঘরে গেলেন এবং চমকে উঠলেন! এ যে অসম্ভব!

দাঁড় থেকে নেমে টেবিলে বসে আছে ঝুঁটি! শুধু বসে নেই, তার সামনে মেজোমামার কম্পিউটারটা খোলা!

মেজোমামা উত্তেজনায় কাঁপছেন। চাপা গলায় বললেন, "মনে হচ্ছে ঠোঁট দিয়ে কোনওভাবে সুইচ অন করে ফেলেছে।"

দু' পা এগোতেই দেখা গেল, ঘটনা অত সহজ নয়। ঝুঁটি মুখ নিচু করে তার বাঁকানো শক্ত ঠোঁট দিয়ে কি-বোর্ডের সুইচ টিপছে। আওয়াজ হচ্ছে খট, খট, খট...।

ও কি খেলা করছে?

পা টিপেটিপে আরও কাছে গেলেন দু'জন। না, ঝুঁটি খেলছে না। সে লিখছে! টাইপ করার ভঙ্গিতে মানুষের আঙুলের মতো তার ঠোঁট চলছে! পরদায় ইংরেজি হরফে যা ভেসে উঠছে, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'তুমি কেমন আছ? আমি ভালই আছি। এদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট। ভয় হচ্ছে, ওজন না বেড়ে যায়! কম্পিউটারটা খেয়াল করিনি বলে এত দিন মেল পাঠাতে পারিনি। এবার থেকে নিয়মিত মেল পাঠাব...।'

মেজোমামার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি মামিমার কানে-কানে বললেন, "কিছু বুঝতে পারছ? বুঝতে পারছ কিছু? মার্ভেলাস! অসাধারণ! ঝুঁটি কম্পিউটারে চ্যাট করছে! ইস, আমারই বুঝতে ভুল হয়েছিল। ঝুঁটি এ যুগের কাকাতুয়া। কোন দুঃখে মুখে কথা বলবে? তারা কথা বলবে কম্পিউটারে।"

আমরা টিকলুকে ধরেছিলাম, শনিবার স্কুল ছুটির পর ওর মেজোমামার বাড়িতে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। আমরা ঝুঁটির কম্পিউটারে চ্যাট করা দেখব। টিকলু জানিয়েছে, সেটা সম্ভব নয়। কম্পিউটার চ্যাট একটা ব্যক্তিগত বিষয়। সেটা অন্য কারও দেখা উচিত নয়। তবে সে কথা দিয়েছে, আমাদের ঝুঁটির ই-মেল নম্বরটা দেবে। ইচ্ছে করলে, আমরা নিজেদের কম্পিউটার থেকে তার সঙ্গে গল্প করতে পারি।

রাত এগারোটার পর মেজোমামা নাকি নিয়ম করে ঝুঁটিকে এক ঘণ্টার জন্য কম্পিউটার ছেড়ে দিচ্ছেন।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

নতুন নাটকও ভণ্ডুল

উল্লাস মল্লিক



'লঘুগুরু নাট্যসমাজ'-এর মিটিং-এ ঠিক হল, গত বারের মতো কেলেঙ্কারি এবার যেন না হয়!

আমোদপুরের বিখ্যাত নাটকের দল লঘুগুরু নাট্যসমাজকে বহু দূর-দূরান্তের মানুষ একডাকে চেনে। পাড়ার ছেলেছোকরা থেকে শুরু করে বাবা-কাকা, মায় ইশকুলের অঙ্কস্যার বা বাজারের আমুদে সব্‌জিওলা— সকলেই কোনও না-কোনও সময় স্টেজে উঠেছেন লঘুগুরুর হয়ে নাটক করতে। ফি বছর দুর্গাপুজোর সময় আমোদপুরে নাটক করে লঘুগুরু। কীসব চমৎকার নাটক আর ফাটাফাটি অভিনয়! সেই নাটক দেখে রাধুচোর সাধু হয়ে গেল, রাগী ইংরেজিস্যার মারধোর ছেড়ে দিলেন! আর সেই কিপটে গোবিন্দকাকা, যিনি কিনা গামছা ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতেন, তিনি বেমক্কা দানধ্যান শুরু করে দিলেন! এরকম আরও অনেক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। সেসব কাহিনি আমোদপুরের মানুষের মুখে-মুখে ঘোরে।

কিন্তু গতবারই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। 'শক্তিগড়ের শার্দূল' নাটক অভিনয় হচ্ছিল। ক্লাবের মাঠে ঠাসাঠাসি ভিড়। সামনের সারিতে এলাকার গণ্যমান্য মানুষজন। দু'জন বয়স্কা মহিলা, নন্দীঠাকুরমা আর মিছরিদিদা পান চিবোতে-চিবোতে নাতিদের বজ্জাতির কথা বলছিলেন। সুখময়জ্যাঠা নাকে চশমা এঁটে ঢুলছিলেন, আর কোন-কোন সংলাপ ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ, তার নোট্‌স নিচ্ছিলেন বাংলাস্যার রণজয়বাবু।

নাটক তখন প্রায় ক্লাইম্যাক্সে। শক্তিগড়ের রাজা গম্ভীর সিংহের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি নিহত। সৈন্যসামন্ত ছত্রভঙ্গ। তবুও গর্জন করে গম্ভীর সিংহ হুমকিপুরের সেনাপতি



তোম্বা শর্মাকে বললেন, "সিংহ-শেয়ালের রণে, কে জেতে কে হারে। যাইবে পুনঃ দেখা কালিকার মুক্ত রণাঙ্গণে।"

এই সময় তোম্বা শর্মার ছোড়া তির আঘাত করবে গম্ভীর সিংহের বুকে। তোম্বা শর্মার পার্ট করছিল গদাই। গদাইটা চিরকালের আনাড়ি। কোনওদিন এক টিপে উইকেটে বল মেরে রান আউট করতে পারেনি। ঘনশ্যামদা ওকে বারবার বলে দিয়েছিলেন, "খুব কাছে দাঁড়িয়ে, আস্তে করে তিরটা ছুড়ে দিবি।"

কিন্তু গদাই বাহাদুরি দেখানোর জন্য, "তুই সিংহ, হাসালি আমায়! জেনে রাখ, আজই শেষ দিন তোর। এখনই চোখে লাগবে যে ঘোর," এসব ফালতু সংলাপ বলে লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে স্টেজের একেবারে কোণে গিয়ে শাঁই করে ছুড়ে দিল তিরটা।

ফল যা হওয়ার তাই হল। তিরটা সোজা গিয়ে লাগল সুখময়জ্যাঠার মাথায়। কাঁচা ঘুম ভেঙে যেতে ভয়ানক চটে গেলেন জ্যাঠা। গনগনে লাল চোখে তাকালেন স্টেজের দিকে। গম্ভীর সিংহের পার্ট করছিল বিজু। সে পড়ে গিয়েছে মহা ফ্যাসাদে। অন্য টার্গেটে আঘাত করা তিরে তার মৃত্যুবরণ করা উচিত হবে কি না, তা বুঝতে পারছে না। অসহায়ভাবে উইংসের দিকে তাকাচ্ছে। আর এদিকে, "তোরা একটু শান্তিতে ঘুমোতেও দিবি না," বলে জ্যাঠা তেড়ে গেলেন বিজুর দিকে।

কাঁদো-কাঁদো গলায় বিজু বলল, "আমি নয় জ্যাঠা, গদাই মেরেছে।"

সুখময়জ্যাঠা তখন এক লাফে স্টেজে উঠে গদাইকে ধরতে গেলেন। তারপর দু'জনের মধ্যে সে কী ভীষণ দৌড় প্রতিযোগিতা! এই দৃশ্যটা সবচেয়ে বেশি হাততালি পেলেও, ভন্ডুল হয়ে গেল নাটকটা।

আমাদের ডিরেক্টর ঘনশ্যাম পোদ্দার দাপুটে মানুষ। তিনি গিরীশ ঘোষের মতো গোঁফ আর শম্ভু মিত্রর মতো দাড়ি রাখেন। এই বছর আমাদের নতুন নাটক, 'লঙ্কাপুরী ওলটপালট'। এবার কাস্টিং-এর সময় ঘনশ্যামদা নতুন একটা কৌশল আমদানি করলেন। আমাদের তারাচরণ বিদ্যাপীঠের হেডস্যারের খুব অভিনয়ের শখ। বেশ লম্বাচওড়া, দশাসই চেহারা তাঁর। গলার স্বরটাও গুরুগম্ভীর। ঘনশ্যামদা তাঁকে রাবণের পার্ট দিলেন। ক্লাস এইটের অনীতা ঝগড়ুটে স্বভাবের জন্য পাড়ায় বিখ্যাত। ঘনশ্যামদা তাকে মন্থরা করে দিলেন। কিন্তু সমস্যা হল হনুমানকে নিয়ে। কে আর শখ করে কালামুখো হতে চায়! তড়িৎ স্কুলের স্পোর্টসে প্রতি বছর লং জাম্পে ফার্স্ট হয়। ঘনশ্যামদা তাকে ধরলেন।

কিন্তু তড়িৎ কিছুতেই রাজি নয়। বলল, "পাগল হয়েছ? রাক্ষসখোক্কস, মুনিঋষি, হরিণ, এমনকী, গরুড়পাখি পর্যন্ত সাজতে রাজি। কিন্তু হনুমান! উঁহু, পাড়ায় প্রেস্টিজের বারোটা বেজে যাবে।"

গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বিস্তর বোঝানোর পর তড়িৎ রাজি হল বটে, কিন্তু একটা শর্ত দিল। নাটকে হনুমানের কলা খাওয়ার একটা দৃশ্য রাখতে হবে। একছড়া মর্তমান কলা তার চাই।

রিহার্সাল চলল হইহই করে। স্কুল ছুটির পর রিহার্সাল দিই। কিন্তু হেডস্যার খুব কামাই করেন। রাবণ চরিত্রটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে হেডস্যার বললেন, "ও তোদের ভাবতে হবে না, আমি ঠিক স্টেজে মেকআপ করে নেব।"

অভিনয়ের দিন এসে গেল। দুপুরবেলা তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। এটা ঘনশ্যামদার নির্দেশ। অনেক রাত পর্যন্ত অভিনয় হবে, একটু ফ্রেশ থাকা দরকার।

সন্ধে হতে না-হতেই ক্লাবের মাঠে জমজমাট ভিড়। সুখময়জ্যাঠা যথারীতি সামনের সারিতে। কিন্তু এবার ঘনশ্যামদা কোনও রিস্ক নেননি। প্রথমে ঠিক ছিল, হত্যাটত্যা যা হওয়ার সব ছুরিতে হবে। কিন্তু রামায়ণের যুগে ছুরিকাঘাত খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে, প্রস্তাবটা বাতিল হয়ে গিয়েছে। তাই চাঁদমারি বানিয়ে প্রত্যেক তিরন্দাজকে রোজ টানা এক ঘণ্টা করে তির ছোড়া প্র্যাকটিস করিয়েছেন ঘনশ্যামদা।

নবীনকাকা আমাদের বাঁধা মেকআপম্যান কাম ড্রেসার। দু' মিনিটের মধ্যে যে-কোনও মানুষের ভোল বদলে দিতে পারেন। ইদানীং কানে একটু কম শুনছেন। গ্রিনরুমে ঢুকেই নবীনকাকা তড়িৎকে বললেন, "তোর এমন চমৎকার একখানা লেজ বানিয়েছি না, দেখবি, নাটক শেষ হয়ে গেলেও লেজের মায়ায় আর মানুষ হতে ইচ্ছে করছে না! মনে হবে সারাজীবন হনুমান হয়েই থাকি।"

কিছুক্ষণ পরেই অনীতার সঙ্গে নবীনকাকার লেগে গেল। নবীনকাকা অনীতার পিঠে একটা মাথার বালিশ বেঁধে কুঁজ বানাতে চান। কিন্তু পিঠে বালিশ বাঁধতে অনীতা রাজি নয়। তার দাবি, বালিশ বাঁধার দরকার নেই, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটলেই মন্থরার চরিত্র দিব্যি ফুটে উঠবে।

তবে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারিটা হল মেকআপের শেষের দিকে। টুম্পার মন্দোদরীর পার্ট করার কথা। মেকআপের পর আয়নায় নিজের মুখ দেখেই সে হাউমাউ করে উঠল। আমরা ছুটে গেলাম। টুম্পার সাজ দেখে তো আমাদের চোখ কপালে। এ কী সাজিয়েছেন নবীনকাকা! নবীনকাকা বললেন, "কেন, চেড়ীর সাজ তো এরকমই হবে!"

টুম্পা কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "চেড়ী হব কেন, আমি তো মন্দোদরী!"

নবীনকাকা যত বলেন, "তুমি আমায় বলেছ অশোকবনের চেড়ী।"

টুম্পা তত হাত-পা ছুড়ে বলে, "না, আমি বলেছি মন্দোদরী।"

আমরা বললাম, "ঠিক আছে নবীনকাকা, ওকে নতুন করে মন্দোদরীর মেকআপ করে দিন।"

নবীনকাকা হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন, "আর তো উপায় নেই, রঙের স্টক শেষ। কোনওরকমে চেঁচেপুঁছে টুম্পার মেকআপটা দেওয়া হয়েছে।"

সর্বনাশ! তা হলে উপায়? মন্দোদরী রাবণের স্ত্রী, রাজমহিষী, তাকে ছাড়া নাটক হবে কী করে? টুম্পা তো ভ্যাক করে কেঁদেই ফেলল।

শেষে ঘনশ্যামদা এসে সমাধান করে দিলেন। বললেন, "ঠিক আছে, সাজ যেমন আছে থাক। মন্দোদরীর মুকুটটা ওর মাথায় পরিয়ে দাও। দু'-একটা বাড়তি সংলাপ ঢোকাতে হবে। দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে হবে, প্রচুর শোকতাপ পেয়েছে তো জীবনে, তাই মন্দোদরীকে এই রকম চেড়ীর মতো দেখতে হয়ে গিয়েছে।"

কালিঝুলি মাখা চেড়ীর সাজে সজ্জিত টুম্পাকে ঝলমলে মুকুটটা পরানোর পর যে রূপটা খুলল, তা দেখে আমরা তো বটেই, ঘনশ্যামদা পর্যন্ত চুপ করে গেলেন।

আর সময় নেই, ঢং ঢং করে তৃতীয় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছে দর্শকরা। নাটক শুরু হয়ে গেল।

প্রথম কয়েকটা দৃশ্য বেশ ভালভাবে উতরে গেল। সমস্ত দর্শক একেবারে বুঁদ। সীতার দুঃখে কয়েকজন কেঁদে ফেলল। নন্দীঠাকুরমা আর মিছরিদিদা তো চিৎকার করে মন্থরাকে 'পাজি, শয়তান' বলে গালমন্দ করে বসলেন। আমি বিশ্বামিত্র মুনি সেজেছিলাম। আমার সংলাপে একটা খটমট সংস্কৃত শ্লোক ছিল। সেটার তোড়েই বোধ হয় আমার বাঁ চোয়াল থেকে দাড়িটা খুলে ঝুলে পড়ল। কিন্তু দর্শকরা কিছু বোঝার আগেই, আমি দ্রুত সংলাপ শেষ করে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের একটু উদ্বেগ ছিল হেডস্যারকে নিয়ে। কিন্তু তিনিও চমৎকারভাবে উতরে দিলেন। শুধু একবারই একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন। স্যারের দোষ নেই। বয়স্ক মানুষ, রাবণের ওয়ার্কলোড নিয়ে কিছুটা কাহিল...। গদি আঁটা চেয়ারে বসে একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল স্যারের। দূত এসে সংবাদ দিল, "মহারাজ, কপিসেনারা লঙ্কাপুরীতে বড় বেয়াদপি করছে।"

স্যার বলে ফেললেন, "নিল ডাউন হয়ে থাকতে বলো।"

নাটক প্রায় শেষের দিকে। রাম-রাবণের চূড়ান্ত লড়াই আসন্ন। হেডস্যার কষে একটিপ নস্যি নিলেন ঘুম তাড়ানোর জন্য।

গ্রিনরুমে এদিকে আর-এক বিপত্তি। ঘনশ্যামদা ছোট্ট একটা বেলুন জোগাড় করেছিলেন। ঠিক ছিল, আলতাভরা বেলুনটা রাবণের পোশাকের মধ্যে বুকের কাছে লুকনো থাকবে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর রাম যখন ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়ে রাবণকে ঘায়েল করবেন, তখন কায়দা করে চাপ দিয়ে বেলুনটা ফাটিয়ে দেবেন হেডস্যার। লাল হয়ে যাবে রাবণের পোশাক। খুব বিশ্বাসযোগ্য হবে দৃশ্যটা।

কিন্তু আলতা ভরতে গিয়ে দেখা গেল, বেলুনটা লিক করছে। সর্বনাশ! এ তো যা অবস্থা, মৃত্যুবাণ মারার আগেই রাবণের পোশাক লাল হয়ে যাবে। কিন্তু এত রাতে নতুন বেলুনই বা পাওয়া যাবে কোথায়! ভজা দশরথ সেজেছিল। নাটকে তার আর কোনও ভূমিকা নেই। ঘনশ্যামদা তাকে ফিট করে দিলেন। বললেন, "তুই মগে করে আলতা নিয়ে উইংসের পাশে অপেক্ষা কর। বুকে বাণ খেয়ে স্যার যখন স্টেজে আছড়ে পড়বেন, আলতাটা স্যারের গায়ে ছুড়ে দিবি।"

রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু হল। সে কী ভীষণ যুদ্ধ! রামের পার্ট করছে দেবু। ক'দিন আগেই 'লঙ্কাটা ছোট হলেও ঝাল', এই ট্রানস্লেশনটা পারেনি বলে হেডস্যার তার বাঁ কান ধরে প্রবলভাবে টানাটানি করেছেন। সেই হেডস্যার জনসমক্ষে তার হাতে নিহত হবেন ভেবে, সে বেশ ভয়ে-ভয়ে আছে। হেডস্যারের মাথার এক দিকে চারটে, আর-এক দিকে পাঁচটা প্লাস্টিকের মাথা বেঁধে রাবণের দশটা মাথা তৈরি করা হয়েছে। হাতে তির-ধনুক নিয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে স্টেজের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছোটাছুটি করছেন দু'জনে। দাপাদাপিতে মচমচ করে উঠছে স্টেজ। মাঝে-মাঝে দু'জনে পরস্পরকে হুঙ্কার দিচ্ছেন। নস্যি নিয়ে উজ্জীবিত হেডস্যার ভয়ংকর পরাক্রম দেখাচ্ছেন। হঠাৎ স্যারের মাথার এক পাশ থেকে বাঁধন খুলে পাঁচটা মাথা স্টেজের উপর পড়ে গেল। ঠিক আচমকা অর্ধেক মাথা খসে পড়ায় কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়লেন স্যার। ঘনশ্যামদা উইংসের আড়াল থেকে ফিসফিস করে বললেন, "দেবু, আর দেরি করিস না, বাণ মেরে দে। স্যার, আপনি শুয়ে পড়ুন।"

কিন্তু বাঁধন খুলে মাথা পড়ে গিয়েছে বলে, স্যার মাঝপথেই লড়াই ছেড়ে দিতে রাজি নন। তাঁর এখনও অনেক বিক্রম দেখানো বাকি। স্যারের এক হাতে তির, অন্য হাতে ধনুক। তিরটা ফেলে দিয়ে প্লাস্টিকের মাথাগুলো কুড়িয়ে নিলেন স্টেজ থেকে। তারপর ফের শুরু করলেন যুদ্ধ। বললেন, "এ মুণ্ড নহে তব শরাঘাতে ছিন্ন মুণ্ড, নেহাত শিথিল রজ্জু হেতু এ মুণ্ড হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। তাতে আমি কি ডরাই তোরে ক্ষুদ্র মানব! বীরকুলে যদি জন্ম তব, আইস সম্মুখ সমরে..." ইত্যাদি।

স্যারের হাতে তির নেই, শুধু ধনুক আর প্লাস্টিকের মুন্ডু ঘুরিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। দর্শকরাও বেশ মজা পেয়েছে, হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করছে রাবণকে।

আগের দৃশ্যেই হনুমান কলা খেয়ে খোসাটা স্টেজের উপর ফেলেছিল। যুদ্ধ করতে-করতে হঠাৎ সেই খোসায় পা পড়তেই আছাড় খেল রামরূপী দেবু। দেবুর কোমরে একটা পুরনো চোট ছিল, ক'দিন আগেই ফুটবল খেলতে গিয়ে পেয়েছিল চোটটা। স্টেজের উপর সশব্দে পড়েই যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, "বাবা রে! মরে গেলাম রে...!"

রামকে এভাবে ভূপতিত হতে দেখে রাবণরূপী স্যার বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন। স্যারের এক হাতে প্লাস্টিকের মাথা, অন্য হাতে ধনুক। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে, "দশ গুনিব, এর মধ্যে দাঁড়াও উঠিয়া। অস্ত্র লও হাতে!" বলে বক্সিংয়ের রেফারির মতো কাউন্ট ডাউন শুরু করলেন হেডস্যার।

ভজা বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সে দেখল, একজন স্টেজে পড়ে ছটফট করছে। তাড়াহুড়ো করে তার গায়েই ঢেলে দিল আলতাটা। লাল হয়ে উঠল রামের পোশাক।

পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে উঠল। রক্তাক্ত শরীরে রাম স্টেজে শুয়ে ছটফট করছেন, আর সামনে দাঁড়িয়ে বিকট অট্টহাস্য করে কাউন্ট ডাউন করছেন রাবণরূপী স্যার, "ছয়, পাঁচ, চা-আ-র..."

ঘনশ্যামদা দেখলেন, বিপদ। রাবণের হাতে রাম নিহত হলে রণজয়বাবু তাঁকে নির্ঘাত ছাতাপেটা করবেন। তাই তাড়াতাড়ি পরদা টেনে দিলেন।

আমাদের সকলের রাগ গিয়ে পড়ল তড়িতের উপর। পাজিটা তখনও হনুমানের পোশাকে গ্রিনরুমের সামনে দাঁড়িয়ে শেষ কলাটা খাচ্ছে। ঘনশ্যামদা তেড়ে গেলেন তার দিকে। বিশাল একটা লাফ দিয়ে মুহূর্তে নাগালের বাইরে চলে গেল তড়িৎ, তারপর দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

হেডস্যার বললেন, "একটা ফিতেটিতে নিয়ে আয় তো, লাফটা মেপে রাখি। এই লাফটা দিতে পারলে ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসে ওর প্রাইজ় বাঁধা।"

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন নবীনকাকা। হেসে বললেন, "শুধু লাফানোর আগে ওই লেজটা লাগিয়ে দেবেন। দেখবেন, ওর ধারেকাছে কেউ আসতে পারছে না। তখন বলেছিলাম না, এই লেজের মাহাত্ম্যই অন্য রকম!"

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

বিপিনবাবুর বিপদ

গল্প: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় | ছবি: স্বপন দেবনাথ

জমজমাট রঙিন কমিক্স

(এ-সংখ্যায় দ্বিতীয় কিস্তি)




আমি শেখাব? কেন, আমি কি চোর না ছ্যাঁচড়?
আপনার বুঝি এসব আসে না?
পাগল নাকি? জীবনে পরদ্রব্য ছুঁইনি।
তবে হ্যাঁ, শিখতেই যদি চাও তবে কুড়োরহাটের সামন্তকে গিয়ে ধরো। ভাল চেলা পেলে এখনও শেখায়।
তবে ভাল ভেট দিতে ভুলো না!
তাই যেতাম ভজনবাবু। কিন্তু এত বিদ্যে শিখেই বা কী হবে?
গেরস্ত বাড়িতে ঢুকে তো পাওয়া যায় লবডঙ্কা। বড়জোর কাঁসার বাসন, ধুতি, শাড়ি...


পাইলট হয়ে এসে কি শেষে গোরুর গাড়ি চালাব মশাই?
তা বটে। ভাল চোরেরও আজকাল পেট ভরে না। খুব অরাজকতা চারদিকে।
আড়ি পেতে সব শুনলাম। তা আপনি কৃপণ লোক কেন খুঁজছেন?
তা বুঝতে পারা শক্তটা কী? কৃপণ হল একটা ব্যাঙ্ক।
সেটা ঠিক, তবে কৃপণ নিজের জিনিসই আগলায়, অন্যের গচ্ছিত জিনিসও কি আগলাবে ভাবেন?
অন্যের জিনিস বলে ভাবতে দেবে কে? তাকে একতাল সোনা দিয়ে বলো, 'এটা তোমাকে দিলুম।'
তারপর?
তারপর এসে একদিন তাপ্পি মেরে হাতিয়ে নিলেই হল!
আপনি তা হলে সত্যি-সত্যিই বিপিনবাবুকে সোনাদানা, হিরে-জহরত দিচ্ছেন না?


তাই কি বলেছি? আমারও তো বয়স হল, নাকি? এই তো একশো পেরিয়ে দেড়কুড়ি। তা আমি পটল তুললে ওই বিপিনবাবুই সব পাবেন।
বুঝেছি। বিপিনবাবুকে আপনি জ্যান্ত যখ করে রেখে যেতে চান। এখন আপনার সম্পত্তি দেখছে কে?
গজানন, ফুলকলি, নরহরি সব দিনরাত চোখে-চোখে রাখছে।
তারা কারা? আপনার ছেলেমেয়ে বুঝি?
আরে না না, ওরা সব অশরীরী।
ভূত নাকি?
হ্যাঁ তাই। কিন্তু সামনের শিবরাত্রিতে ভূতেদের মেলা। আমার মুখ চেয়ে পাহারা দিতে রাজি হয়েছে। দেরি দেখলে পালাবে। ভূতদের বিশ্বাস কী!


আপনার ভয়ডর নেই নাকি মশাই?
খুব আছে। তবে কিনা সোনাদানা, হিরে-জহরতের মায়া কি কম?
তারপর?
তারপর বেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলছে।
তারাও আমায় ঘাঁটায় না, আমিও তাদের ঘাঁটাই না।
কাশাবাসী মাসি এক কাপ গরম চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ভজনবাবু একগাল হেসে উঠলেন।
এসো খুকি, এসো।
তা নামটা কী তোমার?
আজ্ঞে, আমি কাশীবাসী। গরিবের বাড়িতে একটু কষ্ট হবে। বিপিন আপনার জন্য ময়দা মাখতে বসেছে, এল বলে!
আহা, তার আসার দরকার কী? মাখুক না ময়দা, কী বলো হে?
আজ্ঞে, অতি খাঁটি কথা। তা ভজনবাবু, এই সাংঘাতিক জায়গাটা কোথায় বলুন তো!


কাছে না দূরে, পুবে না পশ্চিমে, এসব বলে কি নিজের আখের খোয়াব হে? আমাকে অত আহাম্মক পাওনি।
তা ঠিক। সকলকে বলে বেড়ালে গুপ্তধনের মানমর্যাদা থাকে না। মোহর তা হলে ওই সাত ঘড়াই তো?
পাক্কা সাত ঘড়া। গত ষাট বছর ধরে রোজ গুনে-গুনে দেখছি!
আর ইয়ে, ভজনবাবু, হিরে, মুক্তো কতটা হবে?
তা ধরো, আরও সাত ঘড়া।
আপনি প্রাতঃস্মরণীয় নমস্য মানুষ। একটু পা টিপে দেব কি ভজনবাবু?
খবরদার না।
আচ্ছা, আপনার তো একজন কাজের লোকও দরকার, নাকি?
না বাবা, একাই দিব্যি আছি।



(এর পর আগামী সংখ্যায়)

এবার পুজোয় হাইবারনেসিয়াম

সুকুমার রুজ



সুমনের স্কুলে পুজোর ছুটি পড়েছে আজ থেকে। আর তিতলির স্কুলে ছুটি পড়বে পরশু। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সুমনের মনে পড়েছে, আজ স্কুল যেতে হবে না। এমনিতে ওর স্কুল না থাকলেই খারাপ লাগে। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে কাটানোর মজাই আলাদা। কিন্তু আজ স্কুল নেই মনে পড়তে যেন একটা খুশির হাওয়া বয়ে গেল ওর মনে! রবিবারের ছুটি তো নয়, পুজোর ছুটির প্রথম দিন আজ। সাদা-সাদা মেঘ-ভাসা আকাশে, আর শিউলি-গন্ধ বাতাসে যেন কেমন ছুটি-ছুটি আলস্য। তাই, ওর মনটাও কেমন যেন উদাস-উদাস!

ভোরবেলা উঠে, যথারীতি ব্যায়ামট্যায়াম করে, জলখাবার খেয়ে, পড়তে বসেছে দু'ই ভাইবোনে। কিন্তু আজ সুমনের পড়ায় মন বসছে না মোটেও। তাই ও উঠে, দিদির পাশে গিয়ে বসল। দিদি বই মুখে বসে থাকলে কী হবে, ওরও তেমন পড়ায় মন নেই। ভাইয়ের ছুটি পড়ে গেল। তাকে এখনও দু' দিন স্কুলে যেতে হবে একা-একা। ভাল্লাগে না।

সুমন পাশে বসতেই তিতলি দিদিসুলভ গলায় বলল, "কী রে! পড়া বাদ দিয়ে উঠে এলি যে!"

"এমনিই। আজ পড়তে ভাল লাগছে না রে দিদি।"

তিতলি খোলা বই বন্ধ করে বলল, "আমারও আজ একদম পড়তে ইচ্ছে করছে না।"

সুমন বলল, "কেন? তোর পড়তে ইচ্ছে করছে না কেন?"

"এমনিই," বলে হাল্‌কা হাসল তিতলি।

সুমন বলল, "ধ্যাত! 'এমনি' বলে কিছু হয় না। বল না দিদি, কী ভাবছিস তুই?"

তিতলি চাপা গলায় বলল, "আমি ভাবছি, পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার কথা। এবার কোথায় যাওয়া যায় বল তো!"

সুমনের উদাস গলা, "কী জানি! কোথায় নিয়ে যাবেন বাপি! বাপির তো হয় সমুদ্র, নয় পাহাড়। একঘেয়ে। আর ভাল্লাগে না।"

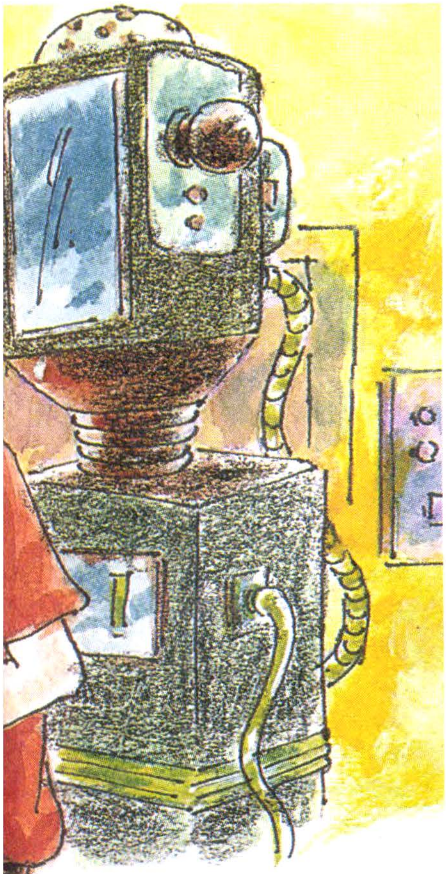
"বাপি কেন? তুই কি ভুলে গেলি, ছোটকাকু আসছেন পরশু দিন। কাকুর সঙ্গে যাব নতুন কোনও জায়গায়। দারুণ মজা হবে।"

"ঠিক বলেছিস দিদি। ওহ! গত বছর পুজোর ছুটিতে 'ব্যাথিস্কোপ সিটি' নিয়ে গিয়েছিলেন কাকু। কী দারুণ যে লেগেছিল!"

তিতলি বলল, "কাকুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার মজাই আলাদা। অবশ্য কাকু নিয়ে যাবেন এক দিনের টুরে। বিজ্ঞাননগরী, আজব দুনিয়া, কিংবা ব্যাথিস্কোপ সিটির মতো কোনও মজার জায়গায়।"

"আরে! ওই সব জায়গায় কাকুর সঙ্গে গিয়েই তো বেশি মজা! কাকু বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের বিষয়গুলো কেমন সুন্দর বুঝিয়ে দেন, সেটা বল।"

"হ্যাঁ, তা যা বলেছিস! এবার কোথায় যাওয়া যায় বল তো ভাই!"



"তাই তো! কোথায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলা যায় কাকুকে? সবই তো দেখা। নিকো পার্ক, সায়েন্স সিটি, প্ল্যানেটোরিয়াম, এনার্জি পার্ক, ব্যাথিস্কোপ সিটি, সবই ঘোরা।"

"ভাই! তুই দেখেছিস, টিভিতে একটা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—

'চলে আসুন ঘুমের দেশে
হাইবারনেসিয়ামে এসে।
দেখে যান আজব কিছু
দশেতেও ছোট্ট শিশু।
ঘুমিয়ে বছর বিশেক
রিপ ভ্যান জাগল কীসে।' "

"হ্যাঁ, বিজ্ঞাপনটা দেখেছি তো! একটা ছোট বাচ্চাকে দেখিয়ে বলে, তার বয়স নাকি দশ বছর! আর আমার মতো একটা ছেলেকে দেখিয়ে বলে, তার বয়স নাকি তিরিশ বছর! সে বিশ বছর 'লাইফ-চেম্বারে' ঘুমিয়ে ছিল। কী আজগুবি! তাই না দিদি!"

"না রে! আজগুবি নয়, সত্যি। আমার এক বন্ধু গিয়ে দেখে এসেছে। স্কুলে গল্প করছিল। বলল, হাইবারনেসিয়াম এক মজার জায়গা। ওখানে বয়স বাড়লেও বুড়ো হয় না। সেই সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' গল্পের কাণ্ডকারখানা যেন! পড়িসনি? সেই টাকলু, দেড়েল বুড়োটার বয়স ছিল তেরো বছর। চল্লিশ বছর বয়স হলেই আবার উলটো দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তখন কমতে থাকে বয়স।"

সুমন মাথা নাড়ল, "না না, সেরকম নয়। ঠিক তার উলটো। এখানে বয়স বাড়ছে, কিন্তু বুড়ো হচ্ছে না। 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল'-এর গল্প পড়িসনি? কুড়ি বছর ঘুমিয়ে ছিল রিপ ভ্যান। সেরকম।"

তিতলি আপত্তি জানাল, "না, মোটেও সেরকম নয়। যুবক রিপ ভ্যান তো কুড়ি বছর ঘুমিয়ে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল!"

সুমন দিদির কথায় সায় দিল, "তা-ও তো ঠিক! অদ্ভুত ব্যাপার! এ নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের কারসাজি! কাকু এলে, কাকুর কাছ থেকেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।"

"এতক্ষণে তুই একটা ভাল কথা বলেছিস! এবারে কাকুর সঙ্গে ওই ঘুমের দেশে, মানে হাইবারনেসিয়ামে বেড়াতে যাব।"

"দারুণ আইডিয়া! থ্যাঙ্ক ইউ দিদি, থ্যাঙ্ক ইউ। কাকু ই-মেলে জানিয়েছিলেন 'স্পেস সিটি' থেকে ফিরবেন একুশ সেপ্টেম্বর, মানে আজ। তেইশ সেপ্টেম্বর রাতে ফ্লোরিডায় প্লেনে উঠবেন, চব্বিশ সেপ্টেম্বর রবিবার এখানে পৌঁছে যাচ্ছেন। তার পরের রবিবার ফার্স্ট অক্টোবর। নবমী পড়েছে। ওই দিনই যাব, বুঝলি দিদি! ইয়া, একাইনো ডারমাটেক্সিয়া আপিস-থুপিস!" বলে বাতাসে ঘুসি মারে সুমন।

"দাঁড়া, এখন থেকে এত আনন্দ করিস না। কাকু আসুন, তারপর তো!"

এমন সময় দরজার সামনে মায়ের গলা, "কী ব্যাপার! দু'জনে বসে-বসে কীসের প্ল্যান হচ্ছে? পড়া বন্ধ কেন?"

সুমন অপ্রস্তুতের হাসি হেসে তড়িঘড়ি উঠে পড়ল, "কিছু না, এমনিই....!" বলে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

তিতলি বই খুলে আড়চোখে ভাইকে দ্যাখে আর মিটিমিটি হাসে।

॥ ২ ॥

আজ সকাল থেকেই সুমন আর তিতলির মনে খুশির হাওয়া। ছোটকাকু ফ্লোরিডা থেকে আজই এসে পৌঁছচ্ছেন। ওদের বাপি তো সকাল আটটায় গ্র্যাভিটার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন এয়ারপোর্টে। গ্র্যাভিটার গাড়ির কেরামতি মনে আছে তো তোমাদের! সেই যে, তেল, গ্যাস বা অন্য কোনও শক্তি লাগে না গাড়ি চালাতে। বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির গাড়ি। 'গ্র্যাভিটেশন ফোর্স' মানে অভিকর্ষজ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করে গাড়ি চালানো যায়।

সেই গাড়িতে চড়ে বাবা আর কাকু এসে পৌঁছলেন দুপুরবেলা। কাকু আসা মানেই সুমন আর তিতলির হার্টবিট বেড়ে যাওয়া। কাকু আসা মানেই নতুন কোনও মজার জিনিস পাওয়া, নতুন-নতুন গল্প শোনা। আর কাকুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া তো আছেই। কাকু ফ্লোরিডা থেকে রওনা হওয়ার আগে প্রত্যেকবারই ই-মেল করেন, 'সুমন, তিতলি, তোমাদের কী লাগবে জানাও।'

জানানো হোক বা না হোক, বিজ্ঞানীকাকু মজার-মজার জিনিস আনবেনেই। সবই অবশ্য বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার। কত কী যে এনে দিয়েছেন কাকু! স্বপ্ন-রেকর্ডার, ইচ্ছে-রিমোট, হাঁটলেই বিদ্যুৎ তৈরি হবে এমন যন্ত্র এস এল বি পি, আরও কত কী! এমনকী, বাবার জন্য ওই গ্র্যাভিটার গাড়িটাও কাকু নিয়ে এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। দেখা যাক, কাকু এবার কী নিয়ে এসেছেন। সুমন অবশ্য জানিয়েছিল, তার ল্যাপটপটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ঠিকমতো কাজ করছে না। বোধ হয় ওর জন্য পকেট কম্পিউটারই নিয়ে এসেছেন! বিশ্রাম নেওয়ার পর, বিকেলে লাগেজ না খোলা অবধি কিছু তো জানা যাচ্ছে না। কাকু চমকে দেওয়ার জন্য আগে থেকে কিছু বলতেই চান না। যতক্ষণ না দেখছে, মনটা ধুকপুক করছে সুমনের। তিতলির অবশ্য ওই সব জিনিসে এত লোভ নেই। ওর লোভ গল্প শোনার। অবাক হয়ে যাওয়া গল্প বলেন কাকু। কখনও চাঁদের রাজ্য বা স্পেস সিটির গল্প। কখনও বা সেই অকল্যান্ডের ওয়েটুমু পাহাড়ের গুহায় চালাক মশাদের কাণ্ডকারখানার গল্প! তিতলি মুগ্ধ হয়ে সব শোনে, আর অবসর সময়ে সেগুলো লেখে 'তিতলির ডায়েরি'তে। কাকু তো সদ্য ফিরলেন স্পেস সিটি থেকে। এবার নিশ্চয়ই স্পেস সিটির গল্প বলবেন কাকু। কাকু কীভাবে স্পেস সিটিতে টানেল ওয়ে বানান, এবার জানতে হবে। তারপর তিতলির ডায়েরি লিখে বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দেবে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর কাকু বিশ্রাম

নিচ্ছেন। সুমনও শুয়েছে। কিন্তু ঘুম আসছে না। খেতে বসে কাকুর কাছে জেনেছে, কাকু ওর জন্য একটা আধুনিক কম্পিউটার নিয়ে এসেছেন। সেটা দেখার জন্য মন আনচান করছে।

তিতলি মায়ের পাশে বসে আনাড়ি হাতে নারকেল কুরছে বিদ্যুৎচালিত কুরুনি দিয়ে। বিকেলে পাটিসাপ্টা তৈরি করবেন মা। মা বলেছেন, "পাটিসাপ্টা তৈরি করাটা শিখে নে তিতু। শুধু পড়াশোনা নয়। মেয়েদের ঘরকন্নার কাজও শিখতে হয়।"

তিতলির সেদিকে মন নেই। ওর মন পড়ে আছে কখন কাকু ঘুম থেকে উঠে, চা খেতে-খেতে গল্পের শুরুটা করবেন। আর তখনই হাইবারনেসিয়াম দেখাতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটা পেশ করবে।

কাকুর ঘুম ভেঙেছে বিকেল পাঁচটা নাগাদ। তখন পাটিসাপ্টার মিষ্টি গন্ধে ম-ম করছে সারা বাড়ি। কাকু বিছানা থেকেই হাঁক পাড়লেন, "বউদি! নিশ্চয়ই পাটিসাপ্টা বানাচ্ছ! আহ! কী সুন্দর গন্ধ ছড়িয়েছে! এসব জিনিস কত দিন যে খাইনি!"

পাটিসাপ্টা আর চা খাওয়ার পর্ব শেষ হতেই ছোটকাকু বললেন, "চলো মাস্টার সুমন! বুঝতে পারছি নতুন কম্পিউটারটা দেখার জন্য তোমার মন হাঁকপাঁক করছে। আর পেরজাপতি! তোমার ইচ্ছেও পূরণ হবে। চলো, তোমার তিতলির ডায়েরিতে নতুন কী লিখলে শুনব। তারপর নতুন গল্প শোনাব তোমাদের।

সুমন আনন্দে লাফিয়ে উঠে বাতাসে একটা ঘুসি ছুড়ে বলে উঠল, "ইয়া, একাইনো ডারমাটেক্সিয়া আপিস-থুপিস।"

॥ ৩ ॥

আজ রবিবার। সকাল থেকেই সাজসাজ রব। দুর্গাপুজো, এমনকী লক্ষ্মীপুজোও হয়ে গেল পরশু দিন! তবুও সুমন একপ্রস্থ নতুন প্যান্ট-শার্ট না পরে রেখে দিয়েছে, আজ সেটার উদ্বোধন করবে বলে। নতুন জায়গায় যাবে, নতুন প্যান্ট-জামা না পরলে কি চলে! তিতলি কাকুকে রাজি করিয়েছিল নবমীর দিন রবিবারই হাইবারনেসিয়াম দেখতে যাওয়ার জন্য। মা বলেছিলেন, "পুজোর ঝামেলা, লক্ষ্মীপুজো এসব যাক, তারপর বেড়ানোর কথা ভাবা যাবে।"

অবশেষে আজ মায়ের অনুমতি মিলেছে ঘুমের দেশে যাওয়ার জন্য। মাকে রাজি করানোর কৃতিত্বটা অবশ্য ছোটকাকুরই প্রাপ্য। মা বলেছেন, "ঠাকুরপো, আমাদের যাওয়া হবে না। সবে পুজো গেল। সব অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। তুমি ওদের নিয়ে ঘুরে এসো।"

তিতলি সকাল-সকাল স্নান সেরে পোশাক পরে প্রস্তুত। সুমন এখনও রেডি হতে পারেনি। ও নাইনে ওঠার পর থেকে শরীর গড়ার দিকে খুব নজর দিয়েছে। গতবার এসে কাকু বলেছিলেন, "মগজের সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটাকেও ঠিকমতো তৈরি করা দরকার। তবে বিজ্ঞানী হওয়া যায়। শরীর সুস্থ না থাকলে মগজও স্বাভাবিকভাবে ধারালো হয় না।"

তাই সুমন রোজ ভোরবেলা উঠে কিছু আসন করে, আর গোটা কুড়ি ডন-বৈঠক দেয়। তারপর ভিজে ছোলা-বাদাম আর মিছরি চিবিয়ে খায়। আজ দিদি তাড়া দেওয়ায় ডন-বৈঠক দশটার বেশি দেওয়াই গেল না। ঘামে ভেজা শরীরে কোনওরকমে চিবিয়ে ভিজে ছোলা-বাদাম আর মিছরি গলায় চালান করে। তারপর স্নান করা আর পোশাক পরা দশ মিনিটের মধ্যেই কমপ্লিট। ছোটকাকু সব ব্যাপারেই দারুণ পাংচুয়াল। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়াটা ওঁর একদম পছন্দ নয়। কাকু বলেন, "আমি হলাম মহাকাশবিজ্ঞানী। সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও আমাদের কাছে খুব মূল্যবান। স্যাটেলাইট পাঠানোর সময় নির্ধারিত সময়ের চেয়ে যদি এক সেকেন্ড দেরি হয়ে যায় রকেট ছাড়তে, তা হলে সব গুবলেট হয়ে যেতে পারে। জীবনের ক্ষেত্রেও তাই। সে কারণে, সব সময় পাংচুয়াল হওয়ার চেষ্টা করবে।"

কাকু বলে রেখেছিলেন, ঠিক সাড়ে সাতটায় আমরা রওনা দেব।

ঘুমের দেশ কলকাতা থেকে গাড়িতে দেড় ঘণ্টার পথ। আমরা ন'টায় পৌঁছে যাব নিউ টাউন, সেক্টর-থ্রি'তে বিশাল হাইবারনেসিয়ামের সামনে।

ঠিক সাতটা সাতাশ মিনিটে সুমন রেডি হয়ে এসে কাকুকে বলল, "গুড মর্নিং কাকু। আই অ্যাম রেডি। দিদি তো সকাল থেকেই সেজেগুজে বসে আছে। চলো, এবার ঘুমের দেশ হাইবারনেসিয়াম। ইয়া, একাইনো ডারমাটেক্সিয়া আপিস-থুপিস।"

ছোটকাকু সুমনের ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, "শেষে যে কথাগুলো বললে, ওগুলোর মানে কী সুমন?"

"হুঁ হুঁ, বড় বিজ্ঞানী হলেও, ও তুমি বুঝবে না কাকু। এ হল 'সুমনিশ' ভাষায় আনন্দ প্রকাশ। আমার প্রথম আবিষ্কার এটা।"

কাকু হেসে বললেন, "ঠিক আছে, চলো। গাড়িতে যেতে-যেতে তোমার সুমনিশ ভাষা আমাকে শিখিয়ে দেবে।"

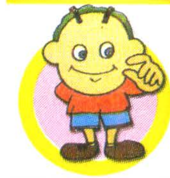
তিতলি বলে উঠল, "কাকু! সাড়ে সাতটা বাজতে আর মাত্র এক মিনিট দশ সেকেন্ড বাকি।"

॥ ৪ ॥

কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে সাতটায় সকলে চড়ে বসলেন গ্র্যাভিটার গাড়িতে। ছোটকাকুর হাতে গাড়ির রিমোট। সুইচ অন করে, রিমোটের বোতাম টিপতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। টার্নিং বাটনে আঙুলের হাল্কা ছোঁয়ায় গাড়ি ডান দিকে ঘুরে গেল। মিনিট পাঁচেক যেতেই ই এম বাইপাস। বাইপাসের সুপার ফার্স্ট চ্যানেল ধরে গাড়ি ছুটছে। সুমন স্পিডোমিটারের স্ক্রিনে চোখ রাখল। হাল্কা সবুজ ডিজিটাল সংখ্যাটা একশো কুড়ি থেকে একশো তিরিশের মধ্যে থাকছে। বেশ কিছুটা গিয়ে গাড়ি আবার ডান দিকে ঘুরল। বাঁ দিকে বি ভট্ট লিটারারি মিউজিয়াম, ডান দিকে জে বোস স্টেডিয়াম। এসব পেরিয়ে গাড়ি সোজা এগোতে থাকল। এবার রাস্তা পুরো ফাঁকা। কাকুর হাতের রিমোটের স্পিড কন্ট্রোল বোতামে আঙুলের চাপ বাড়ছে আর বাড়ছে।

সুমন আর তিতলি এতক্ষণ রাস্তার দু' পাশের দৃশ্য দেখছিল। এখন দু' পাশে শুধু গাছ আর গাছ। সুমন জিজ্ঞেস করল, "কাকু! আমরা তো হাইবারনেসিয়াম দেখতে যাচ্ছি। তো ওর হাইবারনেসিয়াম নাম কেন দেওয়া হল বুঝতে পারছি না। একটু বলো না!"

কাকু একটু গলাটা ঝেড়ে নিলেন। তারপর বললেন, "জায়গাটা খুব মজার। জীববিজ্ঞানীদের এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে এই ঘুমের দেশ বা হাইবারনেসিয়াম। ইংরেজিতে



গল্প

'হাইবারনেশন' বলে একটা শব্দ আছে। যার মানে হল শীতঘুম। শীতঘুম কী জানো তো?"

সুমন চটপট উত্তর দিল, "হ্যাঁ কাকু, শীতকালে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী যেমন, সাপ, তারপর ব্যাঙ, শামুক, এরা গর্তে বা মাটির নীচে ঘুমিয়ে কাটায়। এটাকেই শীতঘুম বলে।"

"রাইট! একদম ঠিক বলেছ। ওই শীতঘুমের সময় প্রাণীগুলো মৃত প্রাণীর মতো থাকে। খাবার খায় না, চলাফেরা করে না। কিন্তু বেঁচে থাকে। এটাকেই বলে হাইবারনেশন। ওই হাইবারনেশন কথাটা থেকেই হাইবারনেসিয়াম। যেমন প্ল্যানেট থেকে প্ল্যানেটোরিয়াম, জিমনাস্ট থেকে জিমনাশিয়াম, এইরকম।

তিতলি বলল, "তা হলে কাকু, ওখানে কি সকলেই শুধু ঘুমোয়?"

"না, সবাই ঘুমোয় না। যাদের ঘুম ভাঙানো হয়েছে, তারা স্বাভাবিক মানুষের মতো খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, পড়াশোনা, সব কিছু করছে। যাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে দশ বছর, বিশ বছর ধরে, তারা ঘুমোচ্ছে। জড়বস্তুর মতো আছে। জাগালে আবার জীবন্ত হয়ে যাবে।"

"দশ-বিশ বছর ধরে ঘুমোচ্ছে? কেমন যেন আজগুবি ব্যাপার!"

"না, আজগুবি নয়, সত্যি। বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে এত বছর ধরে ঘুম পাড়িয়ে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। আবার জাগিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ারও পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।"

সুমন বলল, "কাকু! দশ-বিশ বছর ধরে ঘুম পাড়িয়ে রাখে কেন? ওতে মানুষের কী উপকার হবে? তুমিই তো বলো, 'এমনিতেই মানুষ তার পরমায়ুর অর্ধেক সময় ঘুমিয়ে কাটায়, বেশি ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়!' "

"ঠিকই, অহেতুক ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু কোনও কারণ থাকলে বহু দিন, বহু বছর ধরে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে।"

"সে কারণটা কী কাকু?"

"কারণটা হল, দীর্ঘজীবী হওয়ার লোভ। বহু-বহু বছর বাঁচতে চায় মানুষ। সেটা এই আবিষ্কারের জন্য সম্ভব হয়েছে।"

সুমন বলল, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। একটু বুঝিয়ে বলো না কাকু!"

সামনে ক্রসিংয়ের সিগনালটা লাল হয়ে আছে। তাই কাকু বোতাম টিপে গাড়ির গতি কমান। ব্রেক-বোতাম টিপে সিগনালের আগে গাড়ি থামান। তারপর রিমোটটা পাশে নামিয়ে রেখে হাত দু'টো একটু ঘষে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, "তোমরা বীজ থেকে কী করে গাছ হয়, জানো তো?"

তিতলি বলল, "হ্যাঁ, মাটিতে বীজ পুঁতলে, ঠিকমতো জল, বাতাস আর সূর্যের আলো পেলে, তা থেকে অঙ্কুর বের হয়। সেটাই বড় হয়ে গাছ হয়।"

"ঠিক বলেছ। অর্থাৎ বীজের মধ্যেই গাছ হওয়ার সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। কিংবা বলতে পার, গাছটা বীজের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। যেমন ধরো, একটা হাঁসের ডিমে তা দিলে বা ইনকিউবেটরে দিলে, সেটা থেকে আস্ত একটা হাঁস বের হয়। তার মানে, ওই বীজ কিংবা ডিম কোনওটাই জড়বস্তু নয়। ওর মধ্যেই প্রাণ আছে। এখন মজার ব্যাপার হল, যত দিন না ওই প্রাণের ঘুম ভাঙানো হচ্ছে, ওর বৃদ্ধি হবে না। কিন্তু বয়স বাড়বে সময় পেরনোর সঙ্গে-সঙ্গে। কী মাস্টার সুমন! ঠিক বলছি তো আমি?"

সুমন লাজুক হেসে ঘাড় হেলাল। ইতিমধ্যে সিগনাল সবুজ হয়েছে। কাকু আবার রিমোট হাতে তুলে নিয়ে গাড়ি স্টার্ট করেন। ক্রসিংটা পেরনোর পর আবার বলতে শুরু করেন, "ধরো, একমুঠো মটর দানা নিলে। তা থেকে কিছু নিয়ে মাটিতে বসালে। জল, হাওয়া, আলো পেয়ে তা থেকে মটর গাছ হল। মাস তিনেক বেঁচে থাকল গাছটা। তারপর মরে গেল। অবশিষ্ট মটরগুলো এক বছর রেখে দেওয়ার পর, সেগুলোকে মাটিতে পুঁতলে। গাছ হল, ফল ধরল। এখন বলো তো, ওই গাছের বয়স কত?"

তিতলি বলল, "ফল ধরেছে, তার মানে আড়াই-তিন মাস হবে।"

"না না, হল না। মাস্টার সুমন, তুমি কী বলো?"

সুমন বলল, "এক বছর তিন মাস।"

"রাইট! একদম ঠিক বলেছ। গাছটা বীজের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল এক বছর। গাছ হয়ে বাঁচল তিন মাস। ওদের সঙ্গী মটরদানাগুলো কিন্তু এক বছর আগেই গাছ হয়ে মরে গিয়েছে। এই ব্যাপারটা লক্ষ করে বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, যদি বীজের মতো মানুষের ভ্রূণকে কোনও উপায়ে ওই রকম ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় দশ-বিশ বা পঞ্চাশ বছর, তা হলে তার পরমায়ু বেড়ে গেল! ব্যস! গবেষণা শুরু। গবেষণা করে বের করে ফেললেন এর উপায়। এখন শুধু ভ্রূণ নয়, তোমাদের বয়সি ছেলেমেয়েদেরকেও লাইফ চেম্বারে রেখে দেওয়া হচ্ছে। চেম্বারের গায়ে নাম, জন্মতারিখ দিয়ে স্টিকার মারা রয়েছে। দশ বছর, বিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর পর জীবন্ত করা হবে। সে সময় ওদের স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়ার কথা, তার চেয়ে আরও পরের পৃথিবীকে ওরা দেখতে পাবে। এটাই উদ্দেশ্য।"

তিতলি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল, "ও! এইবার বুঝেছি, টিভিতে দেখানো ছোট্ট বাচ্চাটার বয়স দশ বছর, কিংবা ভাইয়ের মতো ছেলেটার বয়স তিরিশ বছর বলছিল কেন! আসলে, ওরা দশ-বিশ বছর ঘুমিয়ে কাটিয়েছে।"

"ঠিক ধরেছ। এভাবে ওর মৃত্যুর দিনটাকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারল। অর্থাৎ আয়ু বেড়ে গেল। ঘুম ভাঙা তো নয়, যেন পুনর্জন্ম হল!"

তিতলির চোখে-মুখে ঝলমলে খুশি, "তা হলে কাকু, মানুষ এখন মহাভারতের ভীষ্মের মতো ইচ্ছামৃত্যু আবিষ্কার করে ফেলেছে, তাই না!"

"হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। কিংবা বলা যায়, রত্নাকর দস্যু হয়তো এই পদ্ধতিতেই ষাট হাজার বছর উইঢিবির মধ্যে ঘুমিয়ে থেকে, জেগে উঠে রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকি হয়েছিলেন।"

সুমন এতক্ষণ কোনও কথা না বলে কী ভাবছিল কে জানে! ও হঠাৎ প্রশ্ন করল, "কাকু! কে আবিষ্কার করলেন এই পদ্ধতি?"

"দীর্ঘদিন গবেষণা করে এটা আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী ডাঃ আলেকসিস ক্যারেল এবং কর্নেল লিন্ডবার্গ।"

সুমন বিড়বিড় করে মুখস্থ করতে থাকে নাম দু'টো। তারপর বলে ওঠে, "কাকু, হাইবারনেসিয়ামে ওই লাইফ চেম্বার যন্ত্রটা দেখা যাবে তো?"

কাকু গাড়ির গতি কমাতে-কমাতে বললেন, "নিশ্চয়ই দেখা যাবে! সামনে তাকাও। আমরা এসে গিয়েছি ঘুমের

দেশে। ওই দ্যাখো বড়-বড় করে লেখা 'হাইবারনেসিয়াম'।"

সুমন হাত ছুড়ে বলল, "ইয়া, একাইনো ডারমাটেক্সিয়া আপিস-থুপিস!"

॥ ৫ ॥

গ্র্যাভিটার গিয়ে থামল হাইবারনেসিয়ামের কাছাকাছি পার্কিং জোনে। ন'টা থেকে টিকিট কাউন্টার খুলবে। আর মাত্র তিন মিনিট বাকি ন'টা বাজতে। সুমন গিয়ে লাইনে দাঁড়াল।

টিকিট নেওয়ার পর একে-একে সকলকে চেকিং স্ট্যান্ডে উঠতে হল। মেটাল ডিটেক্টর, বম্ব ডিটেক্টর মেশিন গ্রিন সিগনাল দিল। ধ্বংসকামী বাজে লোকেদের থেকে সাবধান হওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। চেকিং স্ট্যান্ড থেকে একটা স্টেপডাউন এলিভেটর দর্শকদের পৌঁছে দিচ্ছে একেবারে ঘুমের দেশের গেটে!

গেট পেরোতেই তো এক মজার ব্যাপার! একটা রোবট দাঁড়িয়ে আছে গেটের ওপাশে। তার সামনে দিয়ে সকলকে যেতে হবে। তার কাছে দর্শক পৌঁছলেই সে বলছে, "গুড মর্নিং। মোস্ট ওয়েলকাম টু হাইবারনেসিয়াম।"

তারপর তার ধাতব হাত বাড়িয়ে প্রত্যেককে একটা করে ফুল দিচ্ছে। সুমনের হাতে এসেছে একটা গোলাপ ফুল, আর তিতলির হাতে গন্ধরাজ। তিতলি শুঁকে দেখল, সুন্দর গন্ধ ফুলটায়। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল ফুলের পাপড়িতে ছোট্ট স্টিকার সাঁটানো। তাতে লেখা 'বয়স দু' বছর'।

সুমন দেখল তার ফুলেও 'দু' বছর তিন মাস' লেখা স্টিকার। ও কাকুর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। কাকু বললেন, "ওই ফুলটা কুঁড়ি অবস্থায় দু' বছর রাখা ছিল বটানিক্যাল লাইফ চেম্বারে। এ সবই ওই আবিষ্কারের কেরামতি।"

আর কিছুটা এগোতেই সেই টিভিতে দেখা তিরিশ বছর বয়সি বালককে চোখে পড়ল। ও সকলকে 'গুড মর্নিং' জানাচ্ছে। ওকে নাম জিজ্ঞেস করলে বা বয়স জিজ্ঞেস করলে হাসি-হাসি মুখে উত্তর দিচ্ছে। সবই অবশ্য ইংরেজিতে। সুমনের মতোই কিশোর ও। ওর নাম পিটার। সুমন পিটারের সঙ্গে ভাব জমাতে উদ্যোগী হল। ও কোন ক্লাসে পড়ে, জিজ্ঞেস করল। পিটার হেসে-হেসে উত্তর দিল। সুমনের ইচ্ছে করল ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে। কিন্তু উপায় কী! পিছনে যে অনেক দর্শকের লাইন! তাই এগোতেই হয়। ছোটকাকু বললেন, "চলো, আগে তোমাদের লাইফ চেম্বার দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

তিতলি আর সুমন ছোটকাকুর হাত ধরে এগোল লাইফ চেম্বারের দিকে। সেখানে গিয়ে কী দেখল, কেমন মজা পেল ওরা, তা কিন্তু বলব না তোমাদের। তা হলে হাইবারনেসিয়াম দেখতে গিয়ে আর মজা পাবে না। বাকিটা তোমরা মা-বাবার সঙ্গে পুজোর ছুটিতে গিয়ে দেখে নিও। যেও কিন্তু!

ছবি: সুদীপ্ত মণ্ডল

হাতের কাছেই আততায়ী

অশোক বসু



এ কের মধ্যে অনেক। জঙ্গল, পাহাড়, সমতল মাটি, চা বাগান, ঝরনা, নদী— বহুবর্ণ প্রকৃতিকে যেখানে এক জায়গায় পাওয়া যাবে, পশ্চিম ডুয়ার্সের সেই দৃষ্টিনন্দন জায়গার নাম চালসা। আর চালসা থেকে যে রাস্তাটা পাহাড়ের উপরে মেটেলিতে উঠে গিয়েছে, সে রাস্তার ধারে যে দোতলা বাড়িটা, সেটা ধনী টিম্বার মার্চেন্ট মৃগাঙ্কমোহন রায়চৌধুরীর বাড়ি। এক সময় যে বাড়ি কোলাহলমুখর হয়ে থাকত মানুষজনের যাওয়া-আসায়, এখন সেই বাড়িই অতীতের স্মৃতিঘর মাত্র। বাড়ির উপর তলায় রান্নাঘর, চানের জায়গা নিয়ে মোট চারখানা ঘর। নীচের তলাতেও তাই। দোতলায় একটা ঘরে থাকেন অসুস্থ মৃগাঙ্কমোহন। আর লম্বা বারান্দার শেষে যে ঘরটি আছে, সেটিতে থাকে মৃগাঙ্কমোহনের একমাত্র পুত্র সাতাশ-আঠাশ বছরের শশাঙ্ক। শশাঙ্কর দু'টো পা-ই জন্ম থেকে অকেজো। ঘরের চার দিকে এলোমেলো করে রাখা অয়েল পেন্টিংগুলো বলে দিচ্ছে, শশাঙ্ক একজন দক্ষ ছবিআঁকিয়ে, ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা।

বাড়িতে বাবা আর ছেলে ছাড়া আরও দু'জন থাকে। দু'জনেই কাজের লোক। অনেক দিন ধরে এ বাড়িতে আছে। একজন মধু। সে রান্নাবান্না ছাড়াও গৃহকর্তার দেখাশোনা করে। অন্যজন সনাতন। শশাঙ্কর দেখভালের দায়িত্ব তার। মৃগাঙ্কমোহনের একমাত্র মেয়ে জয়শ্রীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। জামাই জীমূতকান্তির শিলিগুড়িতে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা। মৃগাঙ্কমোহনের স্ত্রী গত হয়েছেন অনেক দিন আগে।

এই বাড়িতে আজ সকালে এক শোকাবহ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। শশাঙ্ককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তার ঘরে। সকালে ঘরে ঢুকে ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ করে সনাতন। খবর পেয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই মেয়ে-জামাই জয়শ্রী আর জীমূত শিলিগুড়ি থেকে চালসায় চলে এসেছে। নীচের তলার দুই আত্মীয় অলোকেশ আর প্রশান্ত ছাড়াও পরিচিতজনেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন শশাঙ্কর ঘরের সামনে। অসুস্থ মৃগাঙ্কমোহন একবার এসে মৃত সন্তানকে দেখে নিজের ঘরে বিছানার উপর স্থাণুবৎ বসে আছেন।

এখন সকাল সাড়ে এগারোটার কাছাকাছি। জীমূত গিয়েছিল পারিবারিক ডাক্তারের কাছে। ফিরে এসে বলল, "ডেথ সার্টিফিকেট এনেছি। তা হলে আর দেরি করে..."

অলোকেশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আর দেরি করে কী হবে? সৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়। মিছিমিছি মায়া বাড়িয়ে লাভ কী!"

দেখা গেল উপস্থিত সকলেরই তাই মত। প্রতিবেশী নিখিলবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এইবেলা বেরিয়ে পড়া যাক। হলও তো অনেকক্ষণ।"

জীমূতকে ফিরতে দেখে জয়শ্রী এ ঘরে চলে এল। নিখিলবাবুর কথা তার কানে গিয়েছিল। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, "এখনই? এখনই ভাই চলে যাবে!"

জীমূত রুদ্ধ গলায় বলল, "তা ছাড়া আর উপায় কী আছে! তোমার ভাই তো অনেক আগেই চলে গিয়েছে। সম্ভবত কাল রাতেই। ডাক্তারবাবু বললেন যে,

শশাঙ্কর হার্ট অত্যন্ত দুর্বল ছিল। এমনই কিছু ঘটবে, সেটা যেন তিনি আগেই জানতেন। এত অল্প বয়সে চলে যাবে, ভাবা যায়!"

অলোকেশবাবু বললেন, "ভগবানের ইচ্ছের উপর আমাদের কারই বা হাত আছে! কষ্ট হলেও কিছু করার নেই। ডেডবডি বেশিক্ষণ ঘরে রাখা ঠিক নয়।"

ঠিক তখনই দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন থানার ইনস্পেকটর, সঙ্গে একজন সহকারী অফিসার। সকলকে চমকে দিয়ে ইনস্পেকটর বললেন, "দাঁড়ান। ডেডবডি এখনই যাবে না। পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের জন্য থাকবে।"

এমন পরিস্থিতির জন্য কেউই তৈরি ছিলেন না। অবাক হয়ে জীমূত বলল, "কিন্তু আপনারা হঠাৎ?"

ইনস্পেকটর বললেন, "আমাদের ডিউটি করতেই হবে। খবর পেয়েই এসেছি।"

বিস্মিত জয়শ্রী বলল, "খবর? কে খবর দিয়েছে আপনাদের?"

"কেউ একজন দিয়েছে। ওভার ফোন। নাম বলেনি।"

"মানে উড়ো ফোন?"

"মে বি। তবে উড়ো ফোন হোক আর যাই হোক, আমাকে আমার কাজ করতেই হবে।"

"কিন্তু এরকম ফোন কেন?"

"সেই 'কেন'র উত্তর পেতেই এসেছি।"

শশাঙ্কর শরীর সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে বিছানার উপর শোয়ানো ছিল। ইনস্পেকটর সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। সহকারী অফিসার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইনস্পেকটর কাপড় সরিয়ে মৃতদেহ দেখলেন। দেখলেন শশাঙ্কর অচল পা দু'টো। মুখটাও বেশ অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন।

অবাক হয়ে জীমূত বলল, "ব্যাপারস্যাপার তো কিছুই বুঝছি না। কে-ই বা ফল্‌স ফোন করল, আর কেনই বা করল! আপনারা কি কিছু সন্দেহ করছেন ইনস্পেকটর সাহেব?"

ইনস্পেকটর বললেন, "ডেডবডি পরীক্ষা না করে কিছু বলা যাবে না।"

বিরক্ত জয়শ্রী বলল, "অদ্ভুত ব্যাপার তো! কে না কে ফোন করল, আর অমনি আপনারা দুম করে চলে এলেন! ডাক্তারের সার্টিফিকেট রয়েছে। এ তো ক্লিয়ার কেস!"

ইনস্পেকটর দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন, "সরি ম্যাডাম। সব সময় ডাক্তারের ডেথ সার্টিফিকেট শেষ কথা হয় না। সার্টিফিকেটটা দেখি।"

সার্টিফিকেট জীমূতের কাছে ছিল। ইনস্পেকটরের হাতে সেটা দিয়ে বেশ অপ্রসন্ন গলায় বলল, "বুঝতে পারছি না কে হঠাৎ ফোন করতে গেল পুলিশে! সব কিছু রহস্যময় মনে হচ্ছে।"

ইনস্পেকটর ডেথ সার্টিফিকেটটা পড়লেন। তারপর সেটা নিজের পকেটে রেখে বললেন, "এটা আপাতত আমার কাছে থাক। এবার আপনাদের পরিচয় দিন। উনি যে শশাঙ্ক রায়চৌধুরীর দিদি, সেটা তো বোঝা গেল। আপনি? আপনারা?" ইনস্পেকটর ঘরের লোকদের দিকে তাকালেন।

জীমূতকে দেখে মনে হল, এমনই শোকার্ত মুহূর্তে ইনস্পেকটরের কথাবার্তা তার ভাল লাগছিল না। তবু পুলিশের লোক, কিছু বলাও যায় না। তাই সে বলল, "আমি জীমূতকান্তি মিত্র, শশাঙ্কর ভগ্নিপতি। আর এঁরা সকলেই পাড়াপ্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজন, শ্বশুরমশাইয়ের ব্যবসার কর্মচারীরা। এ বাড়ির এই উপরতলায় শ্বশুরমশাই আর বাইরের দু'জন ছাড়া কেউ থাকেন না। উনি অসুস্থ, অন্য ঘরে আছেন। বাইরের লোক বলতে দু'জন কাজের লোক। মধু আর সনাতনদা।"

ইনস্পেকটর বললেন, "ডাক্তারের সার্টিফিকেটে দেখলাম, শশাঙ্ক ডিসেব্‌ল ছিল, চলাফেরা করতে পারত না। ঘরে হুইলচেয়ারও দেখছি।"

জীমূত বলল, "হ্যাঁ। শশাঙ্কর যতটুকু চলাফেরা, তা ওই হুইলচেয়ারেই।"

"আর-একটা কথা মিস্টার মিত্র, ডাক্তার কি ডেডবডি দেখে সার্টিফিকেট দিয়েছেন?"

জীমূত সামান্য ভেবে নিয়ে বলল, "ডাক্তার গুপ্ত এ বাড়ির হাউজ় ফিজ়িশিয়ান। সপ্তাহে তিন দিন শশাঙ্ককে দেখতেন। ওর হার্ট নাকি খুবই উইক হয়ে গিয়েছিল। তবে আজ সকালে তিনি কখন দেখেছেন বলতে পারব না। আমি আর জয়শ্রী তখন ছিলাম না। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থেকে ঘণ্টাদু'য়েক আগে এসেছি।"

ইনস্পেকটর ঘরের অন্য লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা কেউ বলতে পারেন, ডাক্তার গুপ্ত কখন ডেডবডি দেখেছেন?"

ঘরের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। দেখা গেল, কেউই আজ ডাক্তার গুপ্তকে এ বাড়িতে দেখেননি।

একজন বলল, "সনাতনদাই তো শশাঙ্ককে সব সময় দেখাশোনা করত। তাকে জিজ্ঞেস করলেই তো জানা যাবে।"

অনেক দিনের পুরনো পরিচারক সনাতন ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, "না হুজুর, আজ ডাক্তারবাবু আসেননি।"

ইনস্পেকটর বললেন, "স্ট্রেঞ্জ! বডি না দেখেই ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন! ঠিক আছে, ও প্রসঙ্গে পরে ভাবা যাবে। এবার আমার প্রশ্ন..."

জীমূত ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিল। এবার সে বলল, "কিন্তু, ইনস্পেকটর সাহেব, পরিস্থিতিটা একটু বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে না? আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা স্যাড ইনসিডেন্সে আমাদের কারওরই মনমেজাজ ভাল নেই। অযথা সময়ও নষ্ট হচ্ছে।"

"অসুবিধের জন্যে আমি মাফ চেয়ে নিচ্ছি মিস্টার মিত্র। কিন্তু আমি নিরুপায়। প্রশ্ন যখন উঠেছে, উত্তরটাও পেতে হবে। আচ্ছা, কে প্রথম শশাঙ্ককে এই অবস্থায় দেখেন? অবশ্য নিয়মমতো তার কাজের লোক সনাতনেরই প্রথম দেখা উচিত।"

সনাতনকে কিছুটা অপ্রস্তুত দেখাল। সে জীমূত আর জয়শ্রীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "আজ্ঞে, আমিই প্রথম দেখেছি।"

বিছানার দিকে তাকালেন ইনস্পেকটর। বললেন, "বিছানায় কেউ বেশিক্ষণ শুয়ে ছিল বলে তো মনে হয় না। চাদর যেমন থাকে, প্রায় তেমনই আছে। সামান্য এলোমেলো হয়েছে শুধু।"

সনাতন বলল, "আজ্ঞে না হুজুর। দাদাবাবু বিছানায় ছিল না। এই চাকা-লাগানো চেয়ারেই বসে থাকতে দেখেছিলাম। মাথা এক দিকে কাত হয়ে আছে, চোখ দু'টো বেরিয়ে আসছে। আর এই যে ছবিটা দেখছেন, এই ছবির

সামনেই চেয়ারে বসে ছিল। রং করার তুলিটা আর ওই যে কী বলে, রং থাকে যে থালায়...”

“প্যালেট?”

“আজ্ঞে। দু'টোই চেয়ারের পাশে পড়ে ছিল।”

প্রায় শেষ করে আনা যে ছবিটা সনাতন দেখাল, সে ছবিটার কাছে গিয়ে দেখলেন ইনস্পেকটর। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে সূর্য, কিংবা মেঘ ঢেকে দিচ্ছে উদীয়মান সূর্যকে। সূর্য না হয়ে চাঁদও হতে পারে।

ইনস্পেকটর অভিভূত হয়ে বললেন, “ছবি সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান না থাকলেও, বুঝতে পারছি, দারুণ কম্পোজিশন।”

ঘরের লাইট তখনও জ্বলছে। ইনস্পেকটর ছবি থেকে চোখ ফেরালেন লাইটের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, “লাইটটা কি রাত থেকে জ্বলছে সনাতন?”

সনাতন বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

ইনস্পেকটর বললেন, “মনে হয়, রাতের কোনও সময়, সম্ভবত প্রথম দিকেই শশাঙ্ক ভয়ানক অসুস্থ অবস্থায় লাইট জ্বালিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে বিছানা থেকে উঠে কোনওক্রমে হুইলচেয়ারে বসে এই ছবিটার সামনে গিয়ে শেষটুকু আঁকার চেষ্টা করেছিল।”

জীমূতও ছবিটা ভাল করে দেখল। দেখতে-দেখতে বলল, “আমিও অবশ্য ছবিটবির খুব একটা সমঝদার নই, তবে শশাঙ্কর হাত যে সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার হাত, তা বুঝি। এ ছবিতে দেখছি, বিকেলের সূর্য নেমে যাচ্ছে অন্ধকারে। মনে হয় সূর্যাস্তের ছবি।”

ইনস্পেকটর ভাবতে-ভাবতে বললেন, “কিন্তু কেন? মৃত্যুর আগে শশাঙ্ক এই ছবিকে বিশেষ ইম্পর্ট্যান্স দিতে চেয়েছিল কেন? কী মেসেজ আছে এ ছবিতে?”

জীমূত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, “যে বলতে পারত, সে-ই তো নেই। কাল বিকেলেও দিব্যি সুস্থ দেখে গেলাম। আর আজ সকালেই সেই ভয়ংকর ফোন। কার কখন যে কী হয়!”

ইনস্পেকটর নিচু হয়ে শশাঙ্কর মুখ দেখছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “ইউ আর রং, মিস্টার মিত্র। ভুল অনুমান। শশাঙ্কর হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়নি, ইটস আ কেস অফ পয়জনিং। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ওর!”

আশ্চর্য হয়ে অলোকেশবাবু বললেন, “সে কী! বিষক্রিয়া!”

জীমূতও অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, “অ্যাবসার্ড। শশাঙ্ক বিষ খেতেই পারে না।”

ইনস্পেকটর বললেন, “আমি কিছু বলছি না, বলছে বিষক্রিয়ার সিমটমগুলো। বডি পোস্টমর্টেম করলেই বোঝা যাবে।”

জয়শ্রী বলে উঠল, “না না, তা কেমন করে সম্ভব। ও বিষ খাবে কেন?”

জীমূত বলল, “আর শশাঙ্ক বিষ পাবেই বা কোথা থেকে? ও তো চলাফেরাই করতে পারত না। সনাতনদা হুইলচেয়ারে বসিয়ে দিলে তবে সেটা চালিয়ে ক্যানভাসের কাছে গিয়ে ছবি আঁকত।”

জয়শ্রী বলল, “তা ছাড়া ভাই সুইসাইড করতে যাবে কোন দুঃখে! কী অভাব ছিল তার?”

ইনস্পেকটর থমথমে গলায় বললেন, “আমি কিন্তু একবারও বলিনি আপনার ভাই সুইসাইড করেছে। শশাঙ্ককে বিষ দিয়ে খুন করা হয়েছে। ডেলিবারেটেড কোল্ড-ব্লাডেড মার্ডার।”

ঘরের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সকলেই ভীষণ চমকে গিয়েছে। জীমূত আর জয়শ্রী বাক্‌রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল ইনস্পেকটরের এই কথা।

ইনস্পেকটরের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন, সেই সহকারী অফিসার এতক্ষণ ঘরের চার দিক, মেঝে, বিছানা, শশাঙ্কর আঁকার সরঞ্জাম, সব সন্ধানী চোখে দেখছিলেন। এবার ঘরের কোণ থেকে দু'টো পোড়া বিড়ির টুকরো কুড়িয়ে এনে ইনস্পেকটরের হাতে দিয়ে বললেন, “দেখে মনে হচ্ছে, কালই কেউ বিড়ি খেয়েছে এ ঘরে।”

বিড়ির টুকরো দু'টো দেখতে-দেখতে ইনস্পেকটর বললেন, “শশাঙ্ক কি স্মোক করত মিস্টার মিত্র?”

জীমূত বলল, “না তো, আমি কোনও দিন দেখিনি। আর স্মোক করলেও ওসব বিড়িটিড়ি খাবে কেন? তা ছাড়া কে-ই বা ওকে এসব এনে দেবে?”

জয়শ্রীও বলল, “শশাঙ্ক স্মোক করত না, আমি জানি।”

এ সময় একজন প্রতিবেশী বলল, “আমি একদিন সনাতনকে বিড়ি খেতে দেখেছিলাম।”

সনাতন একটা ঢোক গিলে বলল, “খেলেও, আমি কখনও দাদাবাবুর ঘরে বিড়ি খাইনি, হুজুর। বাইরে গিয়ে খাই।”

সনাতনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইনস্পেকটর বললেন, “উত্তেজনার সময় অবশ্য ঘরের ভিতরে আর বাইরে খেয়াল থাকে না। তার মানে তুমি বিড়ি খাও। এনি ওয়ে, শশাঙ্কর বাবা মৃগাঙ্ক রায়চৌধুরী কি তাঁর সম্পত্তির কোনও উইল করেছেন?” ইনস্পেকটর তাকালেন জয়শ্রীর দিকে, “আপনি তো বলতে পারবেন?”

জয়শ্রী বলল, “না, বাবা এখনও কোনও উইল করেননি। তবে শিগ্‌গিরই করে ফেলার ইচ্ছের কথা সেদিন বলছিলেন।”

ইনস্পেকটর বললেন, “দ্যাট্‌স অল। এটুকুই আমার জানার ছিল।”

“আপনি কি বাবার সঙ্গে কথা বলবেন?”

“না থাক, এখন আর ওঁকে ডিসটার্ব করব না।”

এ সময় সনাতনকে গুটিগুটি ঘরের বাইরে যেতে দেখা গেল। সেটা চোখে পড়তেই ইনস্পেকটর বললেন, “এই যে, তুমি কোথায় চললে সনাতন?”

সনাতন থেমে গিয়ে বলল, “আজ্ঞে, কর্তাবাবুর কাছে।”

ইনস্পেকটর জয়শ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার বাবা কি ঘরে একা আছেন?”

জয়শ্রী মাথা নাড়ল, “না তো! বাবাকে দেখার লোক আছে। মধু।”

“নতুন লোক?”

“না। অনেক দিনের বিশ্বাসী লোক।”

সনাতন কিছুটা থমকে গিয়ে বলল, “তা হলে হুজুর, আমি যাব না বলছেন?”

ইনস্পেকটরকে গম্ভীর দেখাল। বললেন, “না। তুমি আমাদের সঙ্গে থানায় যাবে।”

সনাতনকে ভীত দেখাল। বলল, “থানায়? আমি? কেন বলেন তো?”

“উত্তরটা থানাতেই পাবে।”

“কিন্তু আমি আবার কী দোষ করলাম হুজুর?” সনাতনের মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে।

“বললাম তো, এখানে কোনও উত্তর



দেব না।" ইনস্পেকটর সহকারী অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ফারদার ইনভেস্টিগেশনের জন্য সনাতনকে থানায় নিয়ে যান, মিস্টার সামন্ত। আমি ডেডবডি পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করে একটু পরে যাচ্ছি। আর এই জলের গেলাসটাও সঙ্গে নিয়ে যান।"

শশাঙ্কর খাবার জলের গেলাসটা দেখালেন ইনস্পেকটর। সহকারী রুমালে মুড়ে গেলাসটা সঙ্গে নিলেন। গেলাসে জল ছিল না। একটু পরে জিপের শব্দ শোনা গেল। সনাতনকে নিয়ে পুলিশের গাড়ি থানায় চলে গেল।

স্তম্ভিত জয়শ্রী বলল, "সনাতনদা এর মধ্যে আছে, এ তো অসম্ভব ব্যাপার! এত দিনের লোক, সৎ, বিশ্বস্ত... না না, এ কেমন করে সম্ভব!"

জীমূত বলল, "আমারও আশ্চর্য লাগছে। তবে একটা কথা তো ঠিক, শশাঙ্ককে যদি বিষ দেওয়াই হয়, সেটা বাইরের কোনও লোকের পক্ষে কেমন করে সম্ভব!"

জয়শ্রী তবু অবিশ্বাসী গলায় বলল, "কিন্তু কিসের জন্য সনাতনদা এ কাজ করবে? এ কাজ করে তার কী লাভ? অঙ্কটা তো মিলছে না!"

ইনস্পেকটর বললেন, "সেই লাভের অঙ্কটাই আমাদের মেলাতে হবে, মিসেস মিত্র। সনাতনকে পুলিশ কাস্টডিতে নিয়ে গিয়েছি, সন্দেহটা সত্তর শতাংশ তার দিকে যাচ্ছে বলে।"

॥ ২ ॥

থানার এক কোণে সনাতন একজন সর্বস্বান্ত, দেউলিয়া মানুষের মতো জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক তখনই ইনস্পেকটর ঘরে ঢুকলেন। সনাতনের দিকে চোখ পড়তেই সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "সে কী! তুমি ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন সনাতনদা! বোসো, বোসো।"

সামান্য ইতস্তত করে ইনস্পেকটরের মুখোমুখি চেয়ারে বসল সনাতন। তখন তার মুখ থেকে ভয় আর দুশ্চিন্তার মেঘ সরে গিয়েছে। বলল, "আমার কোনও দোষ নেই হুজুর।"

ইনস্পেকটর বললেন, "কিছুমাত্র না। বাড়ির লোকজনের সামনে জিজ্ঞেস করব না বলেই তো তোমাকে এভাবে থানায় নিয়ে এসেছি। গলা শুনে বুঝেছি তুমিই সকালে থানায় ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়েছিলে। কী তাই তো? ঠিক বলছি?"

"তা আজ্ঞে, ঠিকই বলছেন।"

"এবার বলো, সকলে হার্ট অ্যাটাক বললেও তোমার অন্য সন্দেহ হল কেন? তোমার কেন মনে হল, শশাঙ্ককে কোনওভাবে হত্যা করা হয়েছে?"

"তা-তা, মানে, আমি, ইয়ে..."

"বলো, পুলিশের কাছে সত্যি গোপন কোরো না। তোমার কেন মনে হল, শশাঙ্কর মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়?"

সনাতন সামান্য সময় ভাবল। তারপর বলল, "আজ্ঞে, কী বললাম কেউ জানবে না তো?"

"না। আমি ছাড়া কেউ আপাতত জানবে না। এবার নিশ্চিন্তে বলো।"

সনাতন বলল, "আজ্ঞে, ইদানীং দাদাবাবু কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকত। বলত, 'আমি বোধ হয় বেশি দিন বাঁচব না সনাতনদা। কোনও মানুষের লোভই আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।' কয়েক দিন আগে বলল, 'আমার যদি কিছু হয়ে যায়, কেউ যদি কিছু করে, তবে এই ছবিটার মধ্যে সেই লোকটার কথা বলা থাকবে।' "

ইনস্পেকটরকে ভারী কৌতূহলী দেখাল।

"ইন্টারেস্টিং! কোন ছবিটা বলো তো? যেটা আঁকা শেষ হয়নি? ছবিটা আর-একবার ভাল করে দেখতে হচ্ছে। সনাতনদা, তুমি বলছ, শশাঙ্ক বলেছিল ওই ছবির মধ্যে তার মৃত্যুর রহস্য আঁকা থাকবে, তাই তো?"

সনাতন বলল, "হ্যাঁ হুজুর, তাই।"

"আর-একটা কথা, গত কাল তুমি ছাড়া বাইরের কেউ শশাঙ্কর ঘরে ঢুকেছিল?"

সামান্য ভেবে সনাতন বলল, "আজ্ঞে, না হুজুর। বাইরের কেউ ঢোকেনি।"

"বাড়ির কেউ?"

"বাড়িতে লোকই বা কই! ওই জামাইবাবুই সপ্তাহে দু' দিন খোঁজখবর করতে শিলিগুড়ি থেকে আসেন। কালও এসেছিলেন। যাওয়ার সময় একবার ঘরে এসে দাদাবাবুকে দেখে গিয়েছিলেন।"

"তখন তুমি কোথায় ছিলে? দাদাবাবুর ঘরেই?"

"ছিলাম। তবে একবার জামাইবাবুর সিগ্রেট কিনতে মোড়ের দোকানে গিয়েছিলাম।"

"জামাইবাবুই সিগারেট কিনতে পাঠিয়ে ছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর সিগ্রেট ফুরিয়ে গিয়েছিল।"

"গুড।" ইনস্পেকটরকে প্রসন্ন দেখাল। বললেন, "ঠিক আছে সনাতনদা। আমার আর জানার কিছু নেই।"

সনাতন বলল, "এখন আমি বাড়িতে যেতে পারি, হুজুর?"

ইনস্পেকটর বললেন, "না, এখনই তোমার বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই। নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে হতে পারে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বানিয়ে-বানিয়ে কিছু বলতেও পারবে না।"

॥ ৩ ॥

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল, রিপোর্টও পেয়ে গেলেন ইনস্পেকটর। সহকারী অফিসারকে নিয়ে ইনস্পেকটর আবার এলেন মৃগাঙ্কমোহনের বাড়িতে, শশাঙ্কর ঘরে। সকালে যাঁরা বাড়িতে ভিড় করেছিলেন, তাঁদের কেউই তখন ছিলেন না। শুধু একজন কনস্টেবল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। শোকগ্রস্ত বাড়িতে নিস্তব্ধতা থমথম করছে।

ঘরে ঢুকে ইনস্পেকটর শশাঙ্কর শেষ আঁকা সেই ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন ছবিটার দিকে। ঘরে ঢুকল জয়শ্রী আর জীমূত।

জয়শ্রী বলল, "ভাইয়ের কি সৎকারের ব্যবস্থা এখনও হবে না?"

ইনস্পেকটর বললেন, "হ্যাঁ, হবে। লোকজনকে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।"

একটু চুপ করে থেকে জয়শ্রী বলল, "আর সনাতনদার কী করলেন ইনস্পেকটর সাহেব?"

ইনস্পেকটর ছবি থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন, "আপাতত থানায় আছে।"

জয়শ্রী বলতে গেল, "কিন্তু সনাতনদা তো..."

তাকে থামিয়ে দিয়ে ইনস্পেকটর বললেন, "সব কথা বলার সময় এখনও আসেনি, মিসেস মিত্র। পাশার দান তো উলটেও যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সনাতন

খুন করতে যাবে কেন? কী লাভ তার! মোটিভ কী? মোটিভ ছাড়া তো কোনও অপরাধ হয় না। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আবার এই ছবিটার কাছে চলে এলাম। এখন বুঝেছি, এ ছবি মোটেই কোনও বোল্ড কম্পোজিশন নয়, কিন্তু ছবির অন্য অর্থ আছে। ছবিটা দেখেই বোঝা যায়, শশাঙ্ক শেষ মুহূর্তে প্রাণপণ শক্তিতে এই ছবি শেষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। তবু বলা যায়, এ ছবির কনসেপ্ট একটা বিরাট ধাঁধা, আ গ্রেট পাজ়ল।"

শোকের পরিবেশে ইনস্পেকটরের দ্বিতীয়বার আসায় জীমূত মনে-মনে বিরক্ত বোধ করছিল। সে ভ্রু কুঁচকে ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল, "মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এই তো ছবির বিষয়! শশাঙ্কর অন্য ছবির তুলনায় এই ছবি অসাধারণ কিছু মনে হচ্ছে না আমার। আর এ সময় এই ছবিকেই বা এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না।"

ইনস্পেকটর বললেন, "গুরুত্ব কেন দিচ্ছি, সে কথায় পরে আসছি। আর এ ছবিতে অসাধারণ কিছু শিল্পসৃষ্টি করতে চায়ওনি শশাঙ্ক। আমি আগেই বলেছি, এ ছবি শুধু ছবি নয়, একটা মস্ত ধাঁধা। মিস্টার মিত্র, আপনি যা ভাবছেন, তা ভুল। ওটা সেটিং সান নয়, রাইজ়িং মুন। অস্তগামী সূর্য নয়, উদীয়মান চাঁদ।"

জীমূত তিরিক্ষি গলায় বলল, "সো হোয়াট? সূর্য হোক, আর চাঁদ হোক, কিংবা আপনার আবিষ্কার মতো মস্ত ধাঁধাই হোক, ডাজ নট ম্যাটার। সিম্পলি একটা ছবি বই তো নয়।"

"এ ছবিতে শশাঙ্ক তার হত্যাকারীকে আইডেন্টিফাই করে গিয়েছে।" সহসা জীমূতের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইনস্পেকটর কঠিন গলায় বললেন, "মিস্টার জীমূত মিত্র, শুনে রাখুন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে শশাঙ্কর পেটে বিষ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। জলের গেলাসেও বিষ পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে বড় তথ্য, সনাতনকে শশাঙ্ক কয়েক দিন আগে জানিয়েছিল, খুব নিকটজন কেউ তাকে হত্যা করতে পারে। নামটা সে সনাতনকে বলেনি, কিন্তু বলেছিল, এই ছবিতে নামটা বলা থাকবে।"

জীমূত ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, "এসব কী হচ্ছে, ইনস্পেকটর? বিষ পাওয়া গেলেও আমাদের অপমান করতে সাহস পাচ্ছেন কোত্থেকে? এসব নাটক করার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? সনাতনদা কী বলল না বলল, তার জন্য আমাদের এভাবে হ্যারাস করছেন কেন?"

ইনস্পেকটরের মুখে ধারালো একটা হাসি ফুটে উঠল, "উত্তেজিত হবেন না মিস্টার মিত্র, তাতে নিজেরই দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে।"

জয়শ্রী দৃঢ় গলায় বলল, "ইনস্পেকটর সাহেব, আপনি স্পষ্ট করে বলুন কী বলতে চান?"

ইনস্পেকটর বললেন, "আমি খুব দুঃখিত মিসেস মিত্র, কথাগুলো শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। তবু সত্যের খাতিরে সেই অপ্রিয় কাজটা আমাকে করতেই হবে। আমরা শিলিগুড়ি পুলিশের কাছ থেকে জীমূত মিত্র সম্পর্কে যে ইনফরমেশন কালেক্ট করেছি, তাতে তাকে মোটেই অনেস্ট লোক বলা হয়নি। খুবই খারাপ রেকর্ড। অনেক অন্যায় কাজ করে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে-পড়তে আইনের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়েছেন।"

একটু থমকে গেল জয়শ্রী। দুর্বল গলায় বলল, "কিন্তু তার সঙ্গে এ ঘটনাকে জড়িয়ে ফেলছেন কেন?"

ইনস্পেকটর হাসলেন, "আপনার কথা শুনে মিসেস মিত্র মনে হচ্ছে, কথাগুলো শুধুমাত্র কথার কথা। সত্যিই তো, জীমূতবাবুকে আপনার চেয়ে আর কে বেশি ভাল চিনবেন! এবার শুনুন আমার কথা। উদ্দেশ্য ছাড়া কোনও অপরাধ হয় না। আপনার মুখে শুনেছি, আপনার বাবা মৃগাঙ্কমোহন রায়চৌধুরী এখনও কোনও উইল করেননি, কিন্তু শিগগিরই করতে চান। এ খবর জীমূতবাবু জেনেছেন। উইল করলে তাঁর বিপুল সম্পত্তির সিংহভাগ তাঁর একমাত্র সন্তান শশাঙ্কই পেত। শশাঙ্কর অবর্তমানে, মিসেস মিত্র আইন অনুযায়ী আপনি পাবেন। আর আপনার পাওয়া মানেই জীমূতবাবুর পাওয়া। এটাই হচ্ছে অচল, অসহায় শশাঙ্ককে হত্যা করার একমাত্র কারণ। আমার যত দূর ধারণা, গত কাল সন্ধেবেলা সনাতনের অনুপস্থিতিতে শশাঙ্কর জলের গেলাসে বিষ মেশানো হয়েছিল। সনাতন সে সময় জীমূতবাবুর জন্য সিগারেট কিনতে গিয়েছিল, এ কথা

সনাতনের মুখেই শুনেছি। ডাক্তার গুপ্তও স্বীকার করেছেন, তিনি জীমূতবাবুর পীড়াপীড়িতে সরল বিশ্বাসে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে অত্যন্ত ভুল করেছেন।"

উন্মাদের মতো জীমূত চিৎকার করে উঠল, "ইটস ড্যাম লাই। ডাহা মিথ্যে। আমি আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করব।"

ইনস্পেকটর বললেন, "বেশ তো, করুন। দ্য কোর্ট ইজ ওপেন টু অল। আদালত খোলা আছে, চলে যান। তবে কিনা মিস্টার মিত্র, যত চিৎকারই করুন না কেন, মিথ্যে কখনও সত্যি হয় না। শশাঙ্কর আঁকা ছবি তো চোখের সামনেই রয়েছে। কী জানেন, কোনও মানুষ সুইসাইড করার চরম মুহূর্তে ছবি আঁকে না। সে মানসিকতা তখন তার থাকে না।"

জীমূত রুষ্ট হয়ে বলল, "কী তখন থেকে ছবি-ছবি করছেন! ওটা একটা সামান্য ছবি বই তো কিছু নয়। তাই নিয়ে আপনার সাতকাহন..."

জীমূতকে শেষ করতে না দিয়েই ইনস্পেকটর বললেন, "ছবি নয়, ধাঁধার ছবি। বুদ্ধির চোখ দিয়ে ছবিটা দেখলে ধাঁধার উত্তর পাওয়া যাবে।"

অস্থির জয়শ্রী বলল, "বলুন শুনি। কী সেই উত্তর?"

"উত্তরটা হল, এক খণ্ড কালো মেঘ গ্রাস করছে চাঁদকে। চাঁদের আর-একটা নাম হল 'শশাঙ্ক', নিশ্চয়ই জানেন। আর মেঘের অন্য নাম 'জীমূত'। প্রতিবন্ধী বলেই, আমার ধারণা, শশাঙ্কর সিক্সথ সেন্স, মানে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর ছিল। যার জন্য সে বুঝতে পেরেছিল, খুব কাছের কেউ তাকে হত্যা করবে। যার নাম কাউকে বলা ঠিক হবে না। যাকে সে ছবির মধ্যে..."

সম্পূর্ণ কোণঠাসা জীমূত চিৎকার করে উঠল, "না না, আমি জানি না, আমি জানি না কিছু।"

জয়শ্রী আর পারল না নিজের দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়।

এদিকে জীমূতকে কব্জা করতে পারলেও ইনস্পেকটর ভাল করেই জানেন, তাঁর কাছে এমন কোনও আইনগ্রাহ্য তথ্যপ্রমাণ নেই, যার সাহায্যে জীমূতকেই হত্যাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। ছবির প্রসঙ্গ আদালতে টিকবে না। সনাতনের কথারও কোনও দৃঢ় ভিত্তি থাকবে না। জীমূতের বিপক্ষে যায়, এমন কোনও সাবুদও তিনি পেশ করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র উপায়, তীব্র মানসিক চাপ দিয়ে জীমূতের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা। তাঁর বুক পকেটে রাখা যে ছোট্ট রেকর্ডার আছে তাতে জীমূতের নিজের গলার স্বীকারোক্তি রেকর্ড হয়ে থাকবে। সেটাই হবে জীমূতের বিরুদ্ধে তুরুপের তাস। জীমূত ঠকবাজি, প্রতারণা ইত্যাদির মতো অপরাধ করলেও, জন্ম অপরাধী নয়। প্রবল চাপের কাছে বেশিক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

সেই প্রচেষ্টায় ইনস্পেকটর তীব্র দৃষ্টিতে সোজাসুজি জীমূতের চোখে চোখ রেখে বললেন, "জীমূতবাবু, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আপনি বলুন তো, আপনি নির্দোষ?"

জীমূত কিন্তু ইনস্পেকটরের চোখের দিকে তাকাতে পারল না। অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি জানি না, কিছু জানি না।"

কঠিন গলায় ইনস্পেকটর বললেন, "জানেন, আপনি সব জানেন। আপনি আপনার দোষ স্বীকার করুন। ভেবে দেখুন, অন্য কিছু নয়, নরহত্যার মতো মহাপাপ আপনি করেছেন। হত্যা করেছেন সম্পূর্ণ অসহায়, চলচ্ছক্তিহীন একজন মানুষকে, যে কিনা আপনার স্ত্রীর একমাত্র ভাই। বিবেকের কাছে আপনি কোনওদিন শান্তি পাবেন না।"

"না না, আপনি থামুন। আমি কিচ্ছু জানি না।"

"জীমূতবাবু, দোষ স্বীকার করলে আপনি ঈশ্বরের ক্ষমা পাবেন।"

"না, না, আমি, আমি..."

"দোষ স্বীকার করুন। নইলে বিবেকের দংশনে সারাজীবন আপনি ক্ষতবিক্ষত হবেন। অশান্তি আপনার পায়ে-পায়ে ঘুরবে।"

"না... না..."

"জীমূতবাবু, কনফেস করুন। ভেবে দেখুন, খুন, মৃত্যু, ষড়যন্ত্র... বৃদ্ধ পিতার একমাত্র পুত্র, স্ত্রীর আপন ভাই..."

এবার জীমূত সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে বলল, "প্লিজ়, প্লিজ়, আপনি থামুন ইনস্পেকটর! হ্যাঁ, আমি দোষ স্বীকার করছি। আমার এই ভয়ংকর টাকার লোভই...ওঃ, আমি আর পারছি না। ইয়েস, শশাঙ্কর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। আমিই কাল সন্ধেবেলা সনাতনদাকে দোকানে পাঠিয়ে শশাঙ্কর জলের গেলাসে এক ফাঁকে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমিই এ ঘরে দু' টুকরো অর্ধেক খাওয়া বিড়ি ফেলে রেখেছিলাম। কিন্তু এ কী করলাম আমি! শশাঙ্ক তো আমার কোনও ক্ষতি করেনি, সনাতনদাও নয়! অথচ আমি পাপী, মহাপাপী, আমি জঘন্য মানুষ, খুনি, ও হো হো..."

ইনস্পেকটর জামার পকেট থেকে ছোট্ট যন্ত্রটা বের করে বললেন, "এর মধ্যে আপনার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা আছে। আমি জানতাম, স্নায়ুর চাপ আপনি সহ্য করতে পারবেন না। সে স্ট্যামিনা আপনার নেই। সত্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যে নৈতিক শক্তির দরকার, সেটা আপনার মতো অপরাধীর মধ্যে থাকে না।

ঠিক তখনই দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন সদ্য সন্তানহারা হতভাগ্য পিতা মৃগাঙ্কমোহন। তিনি অসুস্থ। কাজের লোক মধু তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছে।

মৃগাঙ্কমোহন শূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ইনস্পেকটরের দিকে। তাকালেন অয়েল পেন্টিংটার দিকে। তারপর ফের ইনস্পেকটরের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি ঠিকই রহস্যভেদ করেছেন অফিসার। জীমূত আমার জামাই, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ফ্লপ সিলেকশন। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এই নরাধমই আমার ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী। সনাতন থানায় ফোন করার জন্য আমাকেই বলেছিল। আমি নিজে করিনি। থানার নম্বরটা ডায়াল করে ফোনটা সনাতনকে দিয়েছিলাম। সে-ই ফোন করেছিল।"

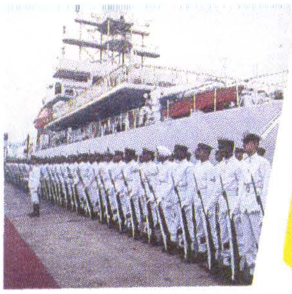
সজল চোখে জয়শ্রী তাকাল বাবার দিকে। মৃগাঙ্কমোহন মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আয় মা, আমার কাছে আয়। এখন থেকে তুই আমার কাছেই থাকবি। সব সময়, সব দিন।"

সহকারী অফিসার সেই মুহূর্তে জীমূতের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিচ্ছিলেন।

ছবি: অনুপ রায়

কুইজ়

বিশ্ব জুড়ে চলছে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি, আর এই প্রস্তুতিতে ভারতও পিছিয়ে নেই। ভারতের নৌবাহিনীর শক্তি এক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই এবারের কুইজ়ের বিষয় হল ভারতের নৌবাহিনী।



১ ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রথম প্রধানের নাম কী?

২ সিন্ধুধ্বজ, সিন্ধুরাজ, শিশুমার, শঙ্কুল, সিন্ধুরক্ষক, সিন্ধুকীর্তি— এগুলোর মধ্যে মিল কোথায়?

৩ বর্তমানে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আই 'এন এস বিরাট'। এর আগের নাম কী ছিল?

৪ ভারতীয় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর দিল্লিতে। এর নাম কী?

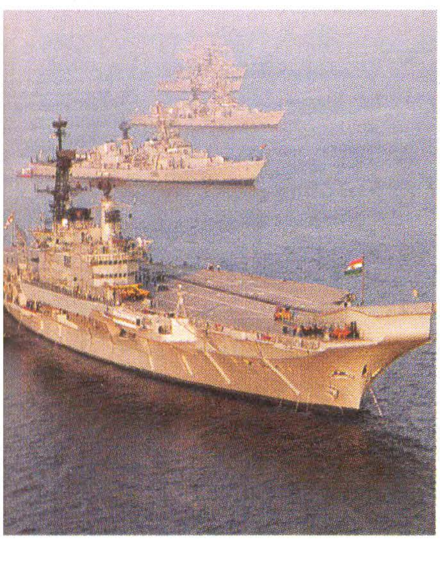
৫ কলকাতায় নৌবাহিনীর যে ঘাঁটিটি রয়েছে তার নাম কী?

৬ ভারতীয় নৌবাহিনীর একমাত্র সাবমেরিন মিউজ়িয়ামের নাম 'আই এন এস কুরসুরা'। কোথায় গেলে এটি দেখতে পাওয়া যাবে?

৭ ভারতীয় নৌবাহিনীর মূলমন্ত্র হল 'শন নৌ বরুণা'। নামটি কে রেখেছিলেন?

৮ কোন ব্যাপারে আই এন এস তরঙ্গিণী, নৌবাহিনীর অন্য সব জাহাজের চেয়ে আলাদা?

অভিজিৎ সুকুল
তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

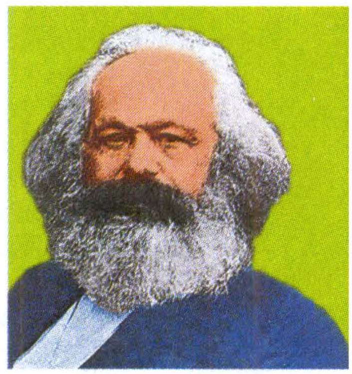


গত সংখ্যার উত্তর

১. পোলোনিয়াম (পোল্যান্ডের নামে)।
২. আমেরিকান ফুটবল।
৩.কপিলদেব।
৪. কোদণ্ড।
৫. উইনস্টন।
৬. নস্ত্রাদামুস।
৭. নিউ ইয়র্ক।
৮. অগ্ন্যাশয়।

জবাব চাই

১. নৌবাহিনীর মূল পোশাকটি সাধারণত কোন রঙের হয়?
২. 'হু'—র পুরো কথাটি কী?
৩. 'দাস ক্যাপিটাল' বইটি কার লেখা?
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)



গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. মহম্মদ আলি। ২. চোখ। ৩. ফেডেরাল বুরো অফ ইনভেস্টিগেশন।

সঠিক উত্তরদাতা

শুভদীপ সেনগুপ্ত, একাদশ শ্রেণি, হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল; **দিশা রায়চৌধুরী,** অষ্টম শ্রেণি, দ্য অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ স্কুল, পুরুলিয়া; **সম্পূর্ণা ভারতী দাস,** গসপেল হোম স্কুল, রিষড়া; **ঐশ্বর্য প্রাজ্ঞ,** নবম শ্রেণি, ডি এ ভি মডেল স্কুল, খড়্গপুর; **শৌর্য লাহিড়ী,** চতুর্থ শ্রেণি, বালিগঞ্জ গভঃ হাই স্কুল, কলকাতা; **সাগ্নিক বিশ্বাস,** চতুর্থ শ্রেণি, নারায়ণপুর এফ পি স্কুল; **সুনীল ঘোষ,** দশম শ্রেণি, পূর্ব বারাসাত আদর্শ বিদ্যাপীঠ, বারাসাত; **পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়,** দশম শ্রেণি, **সত্যেন্দ্র মণ্ডল, রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়,** অষ্টম শ্রেণি, রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম; **সুশান্ত ভট্টাচার্য, রাজদীপ মুখোপাধ্যায়** (ই-মেল মারফত); **নীলাঞ্জন ঘোষ,** পঞ্চম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ব্যারাকপুর; **শ্রীরাধা চট্টোপাধ্যায়,** হিন্দু গার্লস হাই স্কুল, শিবপুর, হাওড়া; **তমোজিৎ মজুমদার,** দশম শ্রেণি, মল্লারপুর ধরণীদেবেন শিক্ষা নিকেতন, বীরভূম; **অভিষেক দাস,** অষ্টম শ্রেণি, ইলিয়স মেয়র স্কুল, কলকাতা; **শিল্পা দাস,** একাদশ শ্রেণি, ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা; **নীতেশ আগরওয়াল,** অষ্টম শ্রেণি, মীরা উচ্চ বিদ্যালয়, পলাশি, নদিয়া; **অনুনয় মণ্ডল,** দশম শ্রেণি, জে এন অ্যাকাডেমি হাই স্কুল, বহরমপুর; **দীপ ঘোষ,** ষষ্ঠ শ্রেণি, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, রিষড়া; **শাশ্বাদিত্য দাশ,** একাদশ শ্রেণি, দ্য সেন্ট জ়েভিয়ার্স স্কুল, মালদা; **অনুপম পাল,** সপ্তম শ্রেণি, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল; **সম্পদ ঘোষ,** পঞ্চম শ্রেণি, বাঁশবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলি; **ইন্দ্রনীল সেন, সৌরভ ঘোষ, সুময় ঘোষ, অর্ণব দাস,** ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **সায়ন্তনী গড়াই,** অষ্টম শ্রেণি, রামপুরহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বীরভূম; **শুভ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,** সপ্তম শ্রেণি, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়, কলকাতা; **সুদীপ্ত সামন্ত,** পঞ্চম শ্রেণি, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

এক বাসের যাত্রী

কৃষ্ণেন্দু বসাক



জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ। কলকাতায় শীতটা যাব-যাব করেও যাচ্ছিল না। সকালের দিকটা এবং সূর্যাস্তের পর অনেকেই গরম পোশাক গায়ে দিয়ে পথে বেরোচ্ছিলেন। রমেশবাবুও একটা হাল্কা শাল গায়ে জড়িয়ে এসপ্ল্যানেডে সন্ধে পাঁচটা কুড়ি নাগাদ ট্রাম থেকে নামলেন।

রমেশবাবু জলপাইগুড়ি যাবেন। মাসের প্রথম তারিখেই তাঁর ভাইপোর বিয়ে। টিকিট সেদিন সকালেই কেটে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই ট্রাম থেকে নেমে স্টার্টারের কাছে বাসের নম্বর জেনে সরাসরি বাসে গিয়ে উঠলেন। সন্ধে সাড়ে পাঁচটার বাস। টিকিটের নম্বর মিলিয়ে আসনে বসার মুহূর্তে পাশের সহযাত্রীর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল। রমেশবাবুর চোখে চোখ পড়তেই ভদ্রলোকের ভ্রু-জোড়া কুঁচকে উঠল।

ভদ্রলোকের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পোশাকপরিচ্ছদ পুরোদস্তুর সাহেবি। গায়ের রং ফরসা, স্বাস্থ্য বেশ ভাল, তবে মাথায় চুল অনেক কম। বয়স রমেশবাবুর তুলনায় কিছু কম। তিনি ইতিমধ্যে ঘোলাটে লেন্সের একটা চশমাও চোখে পরে নিয়েছিলেন।

রমেশবাবু নিয়মিত ভোরে ঘুম থেকে উঠে সঙ্গীদের সঙ্গে মাঠে যান। সেখানে প্রাতঃভ্রমণ, জগিং, হাল্কা ব্যায়াম ইত্যাদি করেন। এভাবে তিনি বহু দিন তাঁর শরীরের ওজন এক জায়গায় ধরে রাখতে পেরেছেন। তাঁর চুলও বেশি উঠে বা পেকে যায়নি। তাই মধ্য চল্লিশেও তিনি বেশ সুদর্শন। স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে সুমন বিয়েতে যেতে পারলেন না। সুমনের এগারো ক্লাসের পরীক্ষা আর পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়ার তদ্বির করার জন্য দরকার তার মাকে।

পাশের ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়ে জানলার কাচটা একটু ফাঁক করে দিলেন। তখন যানবাহনে ধূমপানের উপর এখনকার মতো কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল না। ভদ্রলোকের থেকে চোখ ফেরাতে গিয়ে রমেশবাবুর চোখ তাঁর হাতে ধরা সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে পড়ল। একটা দামি ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেট। প্যাকেটটা দেখে রমেশবাবুর মনটা আচমকা উদাস হয়ে গেল। বারো বছর আগের এক করুণ স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে উঠল। পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি যেচেই আলাপ শুরু করলেন, "দাদা, কদ্দুর যাবেন?"

"শিলিগুড়ি।" উত্তরটা দিয়ে ভদ্রলোক পালটা প্রশ্ন করলেন, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"আমি ভাইপোর বিয়েতে জলপাইগুড়ি যাচ্ছি।" কথাটা বলে রমেশবাবু আলাপচারিতা চালাবার জন্য আবার জিজ্ঞেস করলেন, "চাকরি সংক্রান্ত কোনও কাজে না কি?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "না, আমি চাকরি করি না, ব্যবসা করি। শিলিগুড়িতে আমাদের ব্যবসায়ী মহলের একটা মিটিং আছে।"

রমেশবাবু মন খারাপ করা আবেগটাকে আর চেপে রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন, "দাদা, আপনার হাতের ওই দামি সিগারেটের প্যাকেটটা দেখে আমার ফেলে আসা জীবনের এক



দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এক সময় আমারও ওই ব্র্যান্ডের সিগারেটের শখ ছিল। কিন্তু সেই দুর্ঘটনার পর আমি ওই ব্র্যান্ড ছেড়ে দিই। যে মানুষটি সেই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, সে বলেছিল, তারও নাকি ওই ব্র্যান্ডের উপর খুব আকর্ষণ। যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনাকে সব কথা বলে হাল্কা হতে পারি?"

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না।"

রমেশবাবু অনুমতি পেয়ে বলতে শুরু করলেন, "সে আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন বত্রিশ-তেত্রিশ। একটা নামী বেসরকারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে আমি ম্যানেজারের কাজ করি।

"মালিকের নির্দেশ এল শিলিগুড়ি যেতে হবে। সেখানে 'দাস অ্যান্ড কোম্পানি'র ম্যানেজারকে দিয়ে একটা কন্ট্রাক্ট পেপারে সই করিয়ে অর্ডারের অগ্রিম টাকাটা জোগাড় করতে হবে। বড় অর্ডার, আমাদের কোম্পানির প্রচুর লাভ থাকবে। দাস অ্যান্ড কোম্পানির ম্যানেজার শিলিগুড়ির একটা লজে উঠবেন। ওই লজে আমারও একটা ঘর বুক হয়ে গেল।

"নির্দিষ্ট দিনে সকালেই আমি শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম। লজে গিয়ে কাগজপত্র দেখাতে সেখানকার লোক আমাকে আমার ঘর দেখিয়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই লম্বা বারান্দার ডান দিকে বাঁ দিকে তিনটে করে ঘর। ডান দিকের প্রথম ঘরটা দাস অ্যান্ড কোম্পানির ম্যানেজারের জন্য বুক করা এবং তৃতীয় ঘরটা আমার। তিনি এখনও এসে পৌঁছননি। মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। খেয়েদেয়ে উপরে এসে বারান্দায় পায়চারি করতে-করতে রাস্তার দৃশ্য দেখতে বেশ ভালই লাগছিল। খাওয়ার পর সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস ছিল। পকেট থেকে আমার প্রিয় ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরালাম।

"হঠাৎ পাশ থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'দাদা কি কলকাতা থেকে নাকি?'

"ঘুরে দেখি, বছর পঁচিশের এক যুবক প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

" 'হ্যাঁ।' জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাড়িও কলকাতায় নাকি?'

"সে উত্তর দিল, 'না, আমার বাড়ি হাবড়ায়। আপাতত কলকাতায় এক মেসে আছি।'

"আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কী করো? এখানে কী ব্যাপারে এসেছ?'

"জবাবে যুবকটি তার নামটা বলেছিল। কিন্তু সঠিক নামটা আজ আর মনে নেই, বীরেন বা বারীন জাতীয় কিছু একটা হবে। ধরা যাক বীরেনই। সে বলেছিল, সেদিনই দুপুর দেড়টায় শিলিগুড়িতে তার চাকরির ইন্টারভিউ আছে। সেই জন্যেই তার সেখানে আসা। আমার পাশের ঘরটাতেই সে উঠেছে।

"দুপুরের দিকে সিগারেটটা ঘনঘন হয়ে যেত। বীরেনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই আর-একটা ধরাব বলে প্যাকেটটা বের করলাম। প্যাকেটটা দেখে বীরেনের চোখ দু'টো চকচক করে উঠল। সে বলল, 'এটা আমারও পছন্দের ব্র্যান্ড। কিন্তু বুঝতেই পারছেন ভাঁড়ে মা ভবানী। তাই নেশাটা করে উঠতে পারিনি। কাইন্ডলি একটা দেবেন?'

"আমি একটা সিগারেট বের করে প্যাকেটসুদ্ধ বীরেনকে দিয়ে বললাম, 'তুমি এটা রাখো। আমি পরে কিনে নেব।'

"তারপর নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। ভাতঘুম ভাঙতে-ভাঙতে বিকেল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি, দাস অ্যান্ড কোম্পানির ম্যানেজার লজে পৌঁছে স্নানের জোগাড় করছেন। তাঁকে পরিচয় দেওয়ায় তিনি আমাকে ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর ঘরে আসতে বললেন।

"ঘণ্টাখানেক পরে অ্যাটাচিটা নিয়ে তাঁর ঘরে গেলাম। তিনি কন্ট্রাক্ট পেপারে সই করলেন। ঠিক হল, তিন কিস্তিতে টাকা পেমেন্ট হবে। তিনি প্রথম কিস্তির তিরিশ হাজার টাকা অগ্রিম হিসেবে দিলেন। আমি তিনটে একশো টাকার বান্ডিল অ্যাটাচিতে রেখে তাঁকে তাঁর কাগজপত্র বুঝিয়ে দিলাম।

"ম্যানেজারের ঘর থেকে নিজের ঘরে আসার সময় দেখলাম, বীরেন ইন্টারভিউ দিয়ে ফিরে চুপচাপ তার ঘরে চেয়ারে বসে আছে। আমি তাকে বিরক্ত না করে নিজের ঘরে ঢুকলাম। কিছুক্ষণ পরে বীরেন আমার ঘরে এল। জিজ্ঞেস করলাম, 'ইন্টারভিউ কেমন দিলে?'

" 'ভালই।' উত্তরটা দিয়ে বীরেন প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করল, 'কবে ফিরছেন?'

"উত্তর দিলাম, 'কালই।'

"বীরেন বলল, 'ভালই হল। আমিও কাল ফিরছি। একসঙ্গে ফেরা যাবে। কাল সকালে গিয়ে বিকেলের গাড়ির টিকিটটা কেটে আনব।'

"পরের দিন সকালে জলখাবার খেয়ে বীরেন বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দু'খানা টিকিট কেটে এনে সে আমাকেই রাখতে দিল। এতে অরাজি হওয়ার কিছু ছিল না। একসঙ্গে একই গাড়িতে ফিরব, তাই টিকিট দু'টো রাখতে অমত করলাম না।

"সকালটা দু'জনে গল্প করে কাটিয়ে দুপুরে একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সারলাম। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সময়মতো দু'জনে তৈরি হয়ে নিলাম। লজ ম্যানেজারকে পাওনাগন্ডা বুঝিয়ে দিয়ে আমরা হাঁটতে-হাঁটতে যখন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে পৌঁছলাম, তখনও বাস ছাড়তে কিছু দেরি আছে।

"আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর-পর একটা করে বাস টার্মিনাস থেকে বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বীরেনের হাতে অ্যাটাচিটা দিয়ে আমি শৌচাগারে গেলাম। বেরিয়ে এসে রুমালে হাত-মুখ মুছতে-মুছতে যেখানে আমি আর বীরেন দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানে গেলাম। কিন্তু বীরেন কোথায়? আমাদের সরকারি বাস তখনও ছাড়তে দেরি আছে।

"সামনের এক বাঙালি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা দাদা, একটা ছেলে এখানে অ্যাটাচি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কোথায় গেল?'

"ভদ্রলোক বললেন, 'ছেলেটা তো একটু আগে একটা বেসরকারি বাসে উঠে চলে গেল।'

"শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। অ্যাটাচিতে ছিল কন্ট্রাক্টের অগ্রিম তিরিশ হাজার টাকা। পাগলের মতো বুকিং কাউন্টারের দিকে দৌড়ে গেলাম।

"সব শুনে বুকিং অফিসার বললেন, 'বাসটা দার্জিলিংয়ের দিকে গিয়েছে। আমি বাসের নম্বর ও ছেলেটা কী রকম দেখতে, সব তথ্য ফোন করে পরের পুলিশ ফাঁড়িতে জানিয়ে দিচ্ছি। তাঁরা নিশ্চয়ই বাসটাকে আটকে চোরটাকে ধরে

ফেলবেন।'

"আমার কলকাতা ফেরা মাথায় উঠল। পরের গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে রিকশা নিয়ে ছুটলাম পরের পুলিশ ফাঁড়ির দিকে। সেখানে পুলিশ অফিসারকে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, ছেলেটাকে ধরতে পারেননি?'

"অফিসার উত্তর দিলেন, 'আমরা দুঃখিত। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে ফোন পাওয়ার একটু পরেই আমরা বাসটাকে ধরেছিলাম। বাসে ছেলেটির খোঁজ করতে কন্ডাক্টর বলল যে, অ্যাটাচি হাতে একটা ছেলে শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটের কাছে ভাড়া মিটিয়ে বাস থেকে নেমে গিয়েছে। আমরা আর কিছু করতে পারছি না। বরং শিলিগুড়ি থানায় যোগাযোগ করুন।'

"অফিসারের কথামতো শিলিগুড়ি থানায় বীরেনের নামে এফ আই আর করলাম। তার জন্য আমাকে আবার লজে গিয়ে বীরেনের ঠিকানা জোগাড় করতে হয়েছিল। তবে সে ঠিকানা তার কলকাতার মেসবাড়ির ছিল না, ছিল হাবড়ায় দেশের বাড়ির। বীরেনের চেহারার বর্ণনা থানার ইনস্পেক্টর নোট করে নিয়েছিলেন। এফ আই আর করার পর আমি থানার ওসি-কে অনুরোধ করলাম, 'স্যার, আপনাদের গাড়িটা নিয়ে একবার চলুন না, রাস্তায় একটু খুঁজে দেখি। চোখে হয়তো পড়েও যেতে পারে।'

"ওসি বললেন, 'এই সন্ধেয় সেটা খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো ব্যাপার হবে। তা ছাড়া সেও তো নিশ্চয়ই বসে নেই। এতক্ষণে হয়তো এ তল্লাট ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে। আমি কলকাতা যাওয়ার পথের পুলিশ চৌকিগুলোতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। এন জে পি রেল স্টেশনেও খবর দিচ্ছি, যাতে তাঁরা ডাউন ট্রেনগুলোয় চেকিং-এর ব্যবস্থা করেন। চারদিকের পুলিশি তল্লাশিতে তা না হলে, বীরেনের বাড়ির ঠিকানায় তদন্ত করে আপনার টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে। তবে বীরেনের বাড়িতে তদন্ত হলে তা আমরা করব না, করবে হাবড়া থানার পুলিশ।'

"আমি সে রাতটা শিলিগুড়ি থানাতেই থেকে গেলাম, যদি কোনও জায়গা থেকে খবর আসে এই আশায়। কিন্তু সে রাতে, এমনকী পরের দিন দুপুর পর্যন্ত কোনও খবর না পেয়ে আমি কলকাতার বাস ধরলাম। তার পরের দিন সকালে কলকাতায় পৌঁছে দুপুর নাগাদ হাবড়া থানায় হাজির হলাম। হাবড়া থানার ও সিকে নিজের পরিচয় দিয়ে তদন্তের বিষয়ে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'আমরা শিলিগুড়ি থেকে সময় মতোই খবর পেয়েছিলাম। আমাদের ইনস্পেক্টররা আজ সকালেই বীরেনের বাড়িতে তদন্তে গিয়েছিলেন। তার রিপোর্টও জমা পড়ে গিয়েছে। হাবড়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে বীরেনের বাড়ি। সে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা বহু দিন আগেই মারা গিয়েছেন। জমিজমার আয় থেকে মা-ছেলের কোনও রকমে চলত। পরের দিকে মায়ের অসুখের চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে বীরেনকে অনেকটা জমি বিক্রি করতে হয়েছিল। বছর তিনেক আগে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর বীরেন কলকাতার মেসে চলে এসেছিল। মাঝে-মাঝে সে দেশের বাড়িতে গিয়ে মাকে টাকা দিয়ে আসত। ছ' মাস আগে মায়ের মৃত্যুর সময় তার পৈতৃক সম্পত্তি বলতে ছোট কাঁচা বসত বাড়িটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। আপনি এখন যান, আমরা কোনও খবর পেলেই আপনাকে জানাব। আপনার ঠিকানা তো আমাদের কাছে আছেই।' আমি হতাশ মনে বাড়ি ফিরে এলাম।

"ওদিকে প্রতারিত হওয়ার খবরটা খবরের কাগজ মারফত আমার মালিক জানতে পেরেছিলেন। ধকল কাটিয়ে দু' দিন পরে কাজে যোগ দিলাম। আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েই ছিল। অফিসে যাওয়ার পরেই মালিক আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করোনি। তোমাকে আমি আর কাজে বহাল রাখতে পারছি না। তোমার প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অন্যান্য যা পাওনা আছে, তা আজই মিটিয়ে দিচ্ছি।'

"আমি বললাম, 'স্যার, আমার আগে তো কখনও এরকম কোম্পানির ক্ষতিজনক কাজের উদাহরণ নেই। আমাকে এবারের মতো মাপ করে একটা সুযোগ দিন।'

"মালিক বললেন, 'তা হয় না। তোমাকে মাপ করলে তা একটা নজির হয়ে থাকবে। আমাকে ক্ষমা করো। কোম্পানির কাছ থেকে তোমার যা পাওনা রেডি করা আছে, সইসাবুদ করে সব নিয়ে তুমি আসতে পার।'

"আমার কোনও অনুরোধ-উপরোধই টিকল না। সইসাবুদ করে বরখাস্তের চিঠি ও চেক নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমার পাওনা থেকে খোয়া যাওয়া তিরিশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে চেকটা কাটা হয়েছিল। চাকরিটা চলে যাওয়ায় স্ত্রী-ছেলেকে নিয়ে যেন অগাধ জলে পড়লাম। প্রিয় ব্র্যান্ডের সিগারেট চাকরি যাওয়ার পরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর দু'টো ভাড়া ঘরের একটা ছেড়ে দিলাম। দু'-একটা প্রাইভেট টিউশনিও নিলাম। দুঃসময়ে স্ত্রীর যে সাহচর্য পেয়েছিলাম, তা কখনও ভুলব না।

"যাই হোক, এই ভাবে জীবনযাপন করতে-করতে বারো বছর কাটিয়ে আজ আমি ওই প্রকল্পেরই ক্লার্ক কাম ক্যাশিয়ারের পদে। কষ্টেসৃষ্টে কলকাতার উত্তর শহরতলিতে দু' কাঠা জমি কিনেছি। কবে বাড়ি করতে পারব জানি না।"

গল্প এখানেই শেষ করে রমেশবাবু পাশের সহযাত্রীর দিকে ঘুরলেন। দেখলেন, ভদ্রলোক গল্পের নেশায় বুঁদ হয়ে বসে আছেন। কৃষ্ণনগরে বাস থামলে তাঁরা রাস্তার পাশের হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে নিলেন। যাত্রীদের উঠিয়ে নিয়ে বাস আবার রাতের জাতীয় সড়ক দিয়ে গন্তব্যের দিকে ছুটে চলল। অন্য সব যাত্রীর মতো রমেশবাবুরাও আলো নিভিয়ে ঘুমের আয়োজন করলেন।

পরের দিন সকালে ইসলামপুর পেরিয়ে এক জায়গায় বাস থামিয়ে জলখাবার খাওয়া হল। রমেশবাবুর জলখাবারের দামটা সহযাত্রী ভদ্রলোক জোর করে নিজেই দিলেন। রমেশবাবুর



কোনও ওজর-আপত্তি শুনলেন না।

দেখতে-দেখতে বাস শিলিগুড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছল। ভদ্রলোক বললেন, "দাদা, আমার জায়গা প্রায় এসে পড়ল, এবার নামতে হবে। দয়া করে আপনার ঠিকানাটা দিন, যাতে পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।"

রমেশবাবু তাঁর ব্যাগের সাইড পকেট থেকে অফিসের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর ছাপা একটা কার্ড বের করলেন। তাতে নিজের নাম লিখে কার্ডটা ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। ভদ্রলোক কিছু না পড়েই কার্ডটা জামার বুকপকেটে রেখে দিলেন।

বাস শিলিগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি গিয়ে পৌঁছল। রমেশবাবু দাদার বাড়িতে গিয়ে ভাইপোর বিয়েতে মেতে উঠলেন।

জলপাইগুড়িতে ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে রমেশবাবু কাজে যোগ দিলেন। দিন দু'য়েক পর অফিস বেয়ারা তাঁকে একটা চিঠি এনে দিল। তাঁর নামে ব্যক্তিগত চিঠি। ডাক মারফত পাঠানো হয়েছে। রমেশবাবু পড়তে শুরু করলেন,

'প্রিয় রমেশদা, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমি সেই জলপাইগুড়িগামী বাসে আপনার পাশের সহযাত্রী ওরফে সেই প্রতারক। আপনার চেহারার খুব একটা পরিবর্তন না হওয়ায় আপনাকে আমার চিনতে কষ্ট হয়নি। সেদিন এসপ্ল্যানেডে আপনি বাসে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার চেহারা এই বারো বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চুলও অনেক উঠে গিয়েছে, তার উপর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তাই আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। আপনার সিটটা আমার পাশেই হওয়ায় অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম। পাছে আচমকা আমাকে চিনতে পেরে যান, সেই ভয়ে। তাই আড়াল হিসেবে শুধুমাত্র লেখাপড়ার কাজে ব্যবহৃত চশমাটা সব সময় চোখে লাগিয়ে ছিলাম।

'সেদিন আপনি আমার ব্যক্তিগত কোনও খবর জানতে চাননি। হয়তো সেদিন আপনি শুধু আপনার দুঃখের কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

'এবার আমার গল্পে আসি, চাকরির কয়েকটা পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ দিয়ে বুঝে গিয়েছিলাম, চাকরি আমার ভাগ্যে নেই। তাই ব্যবসার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু ব্যবসা শুরু করতে যে টাকার দরকার, তা আমার ছিল না। সম্বল বলতে ছিল শুধু দেশের পৈতৃক ভিটেটা, যেটা বিক্রি করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না।

'সেদিন শিলিগুড়িতে ইন্টারভিউ দিয়ে ফিরে দোতলায় উঠতেই প্রথম ঘরটার জানলা দিয়ে ভিতরে চোখ পড়ল। দেখলাম, আপনি তিনটে একশো টাকার বান্ডিল অ্যাটাচিতে রাখছেন। মনে লোভ এল। ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে একটা প্ল্যানও ছকে ফেললাম।

'প্ল্যানমতো আপনাকে একসঙ্গে কলকাতায় ফেরার প্রস্তাব দিলাম। আপনি রাজি হয়ে গেলেন। ফেরার দিন সকালে টিকিট কাটতে গিয়ে বেশ কয়েকটা ট্যাবলেট কিনে গুঁড়ো করে রেখে দিয়েছিলাম। দুপুরে খাওয়ার সময় আপনাকে লুকিয়ে সেই গুঁড়ো আপনার খাবারে মিশিয়ে দিলাম।

'ওষুধ ঠিক সময়মতো কাজ শুরু করেছিল। আপনি বাথরুমে যাওয়ার পরেই যে বাসটা ছাড়ল, তাতে বসলাম। জানতাম, বাসে থাকলে ধরা পড়ে যাব। তাই বিধান মার্কেটের কাছে ভাড়া মিটিয়ে নেমে গেলাম। এমন সময় শুনি 'বরুণদা, বরুণদা' বলে কলকাতার একটা ছেলে আমাকে ডাকছে। ফেরার পথে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে কিছু কেনাকাটা করছিল। আমি কলকাতায় ফিরছি শুনে সে আমাকে ওদের সঙ্গে বাসে ফেরার প্রস্তাব দিল। আমি তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলাম।

'শিলিগুড়ির লজে মেসের ঠিকানা দেওয়া ছিল না। দেশের বাড়ির কেউও সে ঠিকানা জানত না। তাই খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। তবে কলকাতার মেসের সহ-বোর্ডাররা খবরের কাগজে আমার নাম নিশ্চয়ই পড়েছে এবং আমাকে সন্দেহ করেছে। এটা মনে করে তাদের অনুপস্থিতিতে মেসে গিয়ে নিজের যে অল্পস্বল্প জিনিসপত্র ছিল, তা নিয়ে মেস ছাড়লাম। কয়েক দিন শিয়ালদা স্টেশনে রাত কাটিয়ে খুব ঘোরাঘুরি করলাম। শেষে দক্ষিণ শহরতলির কুঁদঘাট অঞ্চলে দোকানঘরসহ একটা থাকার জায়গা পেলাম। আগের মেস ছিল মধ্য কলকাতায়। তাই নতুন জায়গায় কেউ আমায় চিনত না। তবে দেশে আর যাওয়া হয়নি। কয়েক বছর আগে গোপনে ও বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছি।

'যাই হোক, সেই সময় আপনি ভাগ্যবিপর্যয়ে পড়লেন, আর আমার জীবনের দিগন্ত খুলে গেল। দু'-তিন মাসের মধ্যেই আমি একটা কলমের ছোট কারখানা চালু করলাম। সেই কারখানা বড় করতে-করতে আজ আমি 'সরকার প্লাস্টিক' কোম্পানির মালিক। আমার কারখানার দু'টো ইউনিটে বেশ কিছু লোক কাজ করে। আমি আজও আপনাকে আমার সমস্ত উন্নতির মূল বলে মনে করি। যদি আমাকে ঘৃণা না করেন, ক্ষমা করেন এবং আমার প্রতিদান গ্রহণ করতে রাজি থাকেন, তবে আপনার ওই টাকা আমি সুদে-আসলে ফেরত দিতে পারি। আপনার ক্ষমাসহ উত্তরের আশায় থাকলাম।'

ইতি

বরুণ সরকার

চিঠিটা পড়ে রমেশবাবুর মনের এক বন্ধ দরজা যেন হঠাৎ খুলে গেল। বাড়ি ফিরে তিনি ভেবেচিন্তে বরুণকে লিখলেন—

'প্রিয় বরুণ, তোমার চিঠি পেলাম। তুমি তোমার অপরাধ অকপটে কবুল করেছ। টাকাটাও সুদে-আসলে ফেরত দিতে চেয়েছ। তাই অনেক ব্যথা নিয়েও তোমাকে ক্ষমা করলাম। সেদিন যা হারিয়েছি তা এ জীবনে আর ফিরে পাব না। তোমার টাকা গ্রহণ করলে তা বাকি জীবনটা কাঁটার মতো বুকে বিঁধে থাকবে। তাই তোমার টাকা গ্রহণ করতে পারলাম না। তবে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করার একটা সুযোগ দিতে পারি। আমার ছেলে সুমন গত বছর দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক পাশ করেছে। তুমি তোমার কোম্পানিতে তাকে একটা ভাল কাজ দিতে পার। উত্তর দিও।'

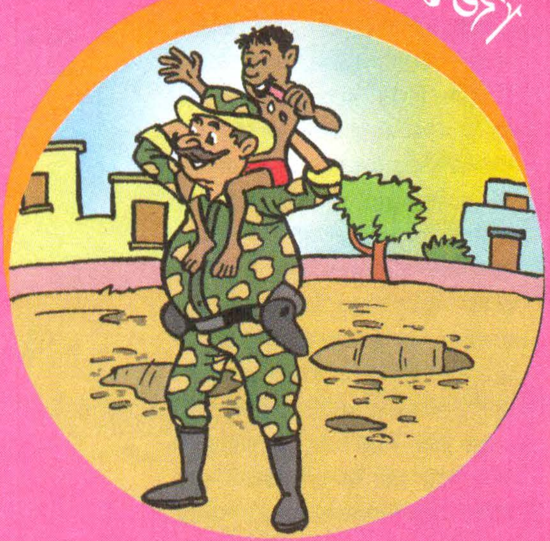
ইতি

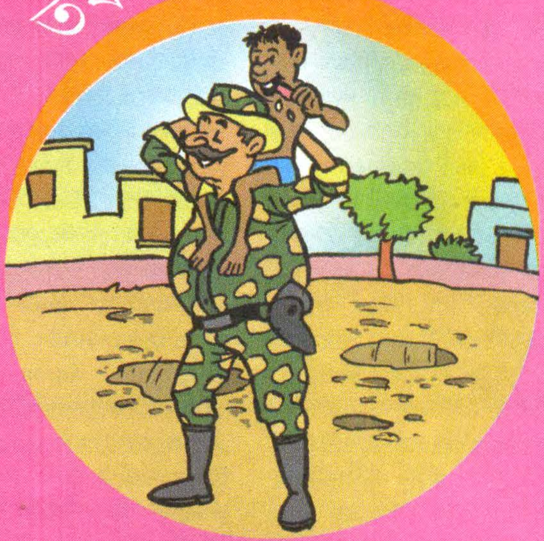
রমেশ দত্ত

বরুণ প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। রমেশবাবু চিঠি পাঠাবার পনেরো দিনের মাথায় সরকার প্লাস্টিক থেকে সুমনের নামে 'হিসাব রক্ষক' পদে একটা সরাসরি নিয়োগপত্র, ডাকপিয়ন রমেশবাবুর বাড়িতে দিয়ে গিয়েছে।

ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো





উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

একটি ছোট মেয়ে ছিট কাপড়ের দোকানে ঢুকে তার পুতুলের জন্য জামার ছিট দেখতে চাইল। মেয়েটির বড়দের মতো হাবভাবে দোকানদার মজা পেয়ে তার সঙ্গে বড়দের মতোই ব্যবহার করল। অনেক কিছু দেখার পর মেয়েটির একটি কাপড় পছন্দ হল। সে দোকানদারকে দাম জিজ্ঞেস করল।
দোকানদার হেসে তাকে বলল, "তোমার মতো মিষ্টি মেয়ের জন্য ওর দাম একটু আদর।"
মেয়েটি গম্ভীরভাবে বলল, "আমার ঠাকুরমা বলেছেন এই দোকান থেকে যা দরকার কিনে নিতে, তিনি কাল এসে দাম দেবেন।"

ছেলেমেয়েদের ঘরে চিৎকার শুনে মা দৌড়ে গেলেন। দেখলেন, তাঁর এক বছরের মেয়ে চার বছর বয়সি দাদার চুল ধরে টানছে। দু'জনকে ছাড়িয়ে দেওয়ার পর মা বড়জনকে বললেন, "বোন তো ছোট, তাই জানে না যে চুল ধরে টানলে তোমার লাগবে।"
ছেলেমেয়েরা আবার খেলছে দেখে মা কাজে চলে গেলেন।
কিছুক্ষণ পর আবার জোরে চিৎকার। মা এসে দেখলেন, ছোট মেয়েটি কাঁদছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে, বড় ছেলেটি বলল, "বোনও এবার জেনে গিয়েছে চুল টানলে লাগে।"

শিক্ষক পৌষালিকে তার বাবার বয়স কত জিজ্ঞেস করায় সে বলল, "আট বছর।" টিচার অবাক হলেন। সে বুঝিয়ে বলল, "আমার বয়স আট, তাই বাবাও 'বাবা' হয়েছেন আট বছর।"

সিদ্ধার্থ তার আঠারো বছরের জন্মদিনে ড্রাইভিং লাইসেন্স হাতে পেয়েছে। খুব খুশি। সকলেকে নিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে যাবে ঠিক করেছে। গাড়িতে ওঠার সময় তার বাবা পিছনের সিটে সিদ্ধার্থের ঠিক পিছনে গিয়ে বসলেন।
সিদ্ধার্থ বলল, "এত বছর গাড়ি চালিয়ে তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত বোধ করছ। এবার আরাম করে পিছনে বসবে।"
সিদ্ধার্থর বাবা মাথা নেড়ে বললেন, "না, এত বছর গাড়ি চালাবার সময় আমার ঠিক পিছনে বসে তুমি আমাকে খুব বিরক্ত করেছ। এবার আমার পালা!"

প্রশ্ন: এমন একটা ইংরেজি শব্দ বলো যা শুরু T দিয়ে শেষও T দিয়ে। আর যার মধ্যেও আছে T।
উত্তর: Teapot.

প্রশ্ন: মানুষখেকো মাছ কোথায় দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগে?
উত্তর: হোটেলে খাওয়ার টেবিলে, রান্না করা অবস্থায়।

প্রশ্ন: খরগোশরা কীসে চড়ে আকাশপথে যাতায়াত করে?
উত্তর: হেয়ারপ্লেন।

অর্থ শেখো

মাধুর্যের জন্য কত দেশি বা বিদেশি শব্দ আমরা কথায় ব্যবহার করেছি। বহুদিন পরে তা আবার একসময়ে হারিয়েও ফেলেছি। এই হারিয়ে যাওয়া শব্দ খুঁজে আনা দরকার। তা না হলে আমাদের সম্পদের ক্ষতি। নীচের শব্দগুলো ওই 'হারাধন'। প্রত্যেকটি শব্দের পাশে আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে কয়েকটি। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে।

জিন্নত: (১) আকাশ, (২) স্বর্গ, (৩) মহাশূন্য, (৪) পবিত্র উদ্যান।

প্রাসাদ: (১) বাড়ি, (২) অট্টালিকা, (৩) যে বাড়ির ছাদ আকাশ স্পর্শ করে, (৪) রাজবাড়ি।

বিধুমুখী: (১) পদ্মমুখী, (২) সুন্দর মুখ যার, (৩) যার মুখ লাবণ্যে ভরা, (৪) চন্দ্রমুখী।

পরভৃৎ: (১) পালিত পক্ষী, (২) কাক, (৩) শালিক, (৪) টিয়া পাখি।

তালিম: (১) তালিকা, (২) তালুক, (৩) শিক্ষা, (৪) তাল ঠোকা।

গত সংখ্যার উত্তর

ধূর্জটি: (৩) শিব। 'ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।' (রবীন্দ্রনাথ)। 'ধূর' শব্দটির অর্থ ভার, তা জটায় বহন করেন যিনি। বিশ্বের ভার বা গঙ্গাকে মাথায় বহন করেন যিনি।

মেহনত: (২) পরিশ্রম। 'যা কিছু দেখবার তা বিনা মেহন্নতে দেখা যায়।' (সৈয়দ মুজতবা আলি)। শব্দটি মূলে ছিল আরবি, এখন বাংলায় চলছে। এর অন্য উচ্চারণ 'মেহনত'।

অনাহূত: (৩) যাকে ডাকা হয়নি। 'আমার মতো অনাহূত লোকও প্রায়ই থাকেন দুই-একজন।' (বনফুল)।

বীতরাগ: (১) যার বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা নেই। 'সকল প্রকার শখ-সাধ আমোদ আহ্লাদের প্রতি শুধু বীতরাগ নয় বীতশ্রদ্ধও ছিলেন।' (প্রমথ চৌধুরী)।

ফিরিস্তি: (৩) তালিকা। 'এ জাতীয় ঘটনা আরও ঘটেছে। তার ফিরিস্তি দিতে যাবে কে?' (মুজতবা আলি)। শব্দটি ফারসি। এখন খাঁটি বাংলা হয়ে গিয়েছে প্রায়।

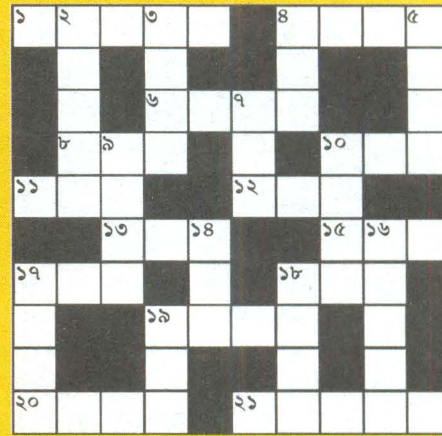
স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) ছেলেটির ডান হাত দেখা যাচ্ছে না। (২) ছেলেটির প্যান্টের রং আলাদা। (৩) লোকটির কোমরের ডান দিকে পিস্তল নেই। (৪) লোকটির চোখ বোজা। (৫) ছবির বাঁ দিকের বাড়ির জানলার কারনিস নেই। (৬) পিছনে ডান দিকের গর্তটি ছোট। (৭) গাছের ডাল নেই। (৮) ছবির বাঁ দিকের বাড়ির উপরের জানলাটি নেই।

সংকেত: পাশাপাশি

(১) ভারতের একটি মহাকাব্য যা বেদব্যাস রচিত। (৪) জোগাড়, ব্যবস্থা, উদ্যোগ। (৬) যন্ত্রণাদায়ক। (৮) প্রকাশিত, প্রদর্শিত। (১০) ভাগ্য, কপাল। (১১) রামায়ণে দশরথের দ্বিতীয় পুত্র। (১২) পদ্ম। (১৩) বর্ষায় পথঘাট এতে ভরে থাকে। (১৫) গাছের ছাল। (১৭) মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। (১৮) মনের কাজ যা হল চিন্তাশক্তি। (১৯) মুসলমান নৃপতি। (২০) ঠাট্টা, তামাশা। (২১) রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংকলন।



সংকেত: উপর-নীচ

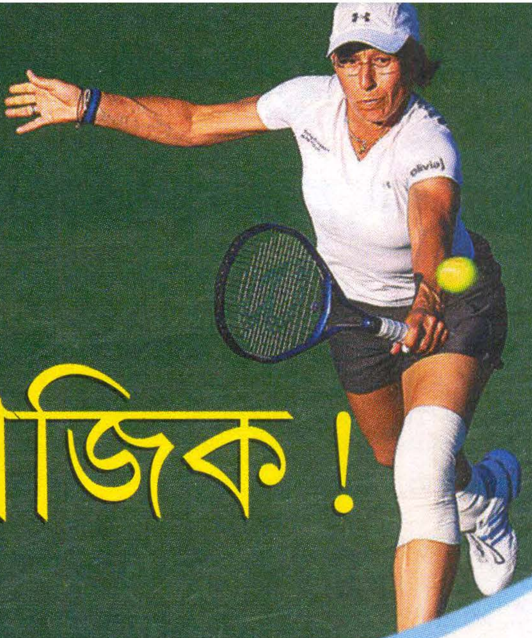
(২) কেনাকাটার জায়গা। (৩) সূর্যের কিরণ। (৪) ভোজন, খাওয়া। (৫) ননি। (৭) পুরণাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারক বা পাঠক। (৯) যা কল্যাণ করে। (১০) যার দেহে শক্তি আছে, ক্ষমতাশালী। (১৪) পুরুষ, সাহসী বা বীরপুরুষ, '— কি হাত হাতিকা দাঁত'। (১৬) স্বর্ণলতা। (১৭) ঘোড়ার মুখের লাগাম বা দড়ি। (১৮) আরম্ভ, পত্তন, সূত্রপাত। (১৯) খবর, সংবাদ 'আজি কি তাহার — পেল রে কিশলয়।'

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

প্রা	সা	দ	ক	ক্ষ		দ	ল	প	তি
	ং		দা			র			র
	ঘা		চা	ল	ভা	জা			ন্দা
	তি	মি	র		বু		স	রো	জ
বি	ক	ট			ক	ল	ম		
		মা	লি	নী			বে	হা	ত
ম	র্ক	ট		লি		বে	ত	স	
ত			মী	মা	ং	সা		নু	
ল			না			মা		হা	
বি	শা	লা	ক্ষী		কৃ	ল	কি	না	রা

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার ৩৪ বছরের টেনিস জীবন আন্তর্জাতিক টেনিসের ইতিহাসে একটা ভিন্ন যুগ হিসেবেই চিহ্নিত হবে। লিখেছেন ভাস্বতী ঘোষ



মার্টিনা ম্যাজিক!

ফো র হ্যা ন্ড

দশ সেপ্টেম্বরের ফ্ল্যাশিং মেডো তাঁর টেনিস জীবনের শেষ খেলার সাক্ষী। এরপর অখণ্ড অবসর! অবশ্য এর আগেও তিনি অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু সাময়িক সে অবসরের শেষে আবার স্বমহিমায় 'যুদ্ধক্ষেত্রে' অবতীর্ণ হতে খুব একটা সময় লাগেনি। তবে এবার যে পাকাপাকি অবসরের পালা, সে কথা কারও অজানা ছিল না। আর অবসর নেওয়ার দিনে টেনিস মহল স্বীকার করতে বাধ্য যে, মার্টিনার ৩৪ বছরের টেনিস জীবন আন্তর্জাতিক টেনিসের একটা যুগ। আসলে পারফরম্যান্স নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অনেক তারকাই ক্রীড়া জগৎ ছাড়তে বাধ্য হন। ফলে শুরুটা অসাধারণ হলেও শেষ মুহূর্তে তালটা কোথাও যেন কেটে যায়। আর সেখানেই মার্টিনা অনন্য! শেষ ম্যাচেও বিজয়ী হয়ে আন্তর্জাতিক টেনিস সার্কিট ছাড়ার মধ্যেই রয়েছে মার্টিনার আভিজাত্যপূর্ণ জীবনের আরও একটা দিক।



এহেন মার্টিনাকে নিয়ে আমেরিকানরা গর্ব করার সুযোগ ছাড়তে মোটেই রাজি নন! কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ১৯৫৬ সালে ১৮ অক্টোবর মার্টিনার জন্ম চেকস্লোভাকিয়ার প্রাগে। ১৯৮১ সালে অবশ্য তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। টেনিসের সঙ্গে গাঁটছড়াও বাঁধা হয়ে গিয়েছিল খুব অল্প বয়সেই! তবে তিনি যে বেশ 'লম্বা দৌড়ের ঘোড়া', সেটা বোঝা গিয়েছিল, যখন মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ফ্লোরিডায় জীবনের প্রথম প্রফেশনাল খেতাব জেতেন।

মার্টিনার র‍্যাকেটই মেয়েদের পাওয়ার গেমকে তখন নতুন মাত্রা দিয়েছে। এরপর জীবনের বড়সড় সম্মানগুলো পেতে আর বেশি দেরি হয়নি। ১৯৭৮ সালে উইম্বলডনে তিনি জীবনের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে তখন তাঁর স্থানটা নিশ্চয়ই অনুমান করা যাচ্ছে? হ্যাঁ, অবশ্যই এক নম্বর। সেই সময় উইম্বলডন থেকে ফরাসি ওপেন ছুঁয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, সব ম্যাচেই তাঁর শেষ হাসি এক অতি পরিচিত ছবি। ১৯৮৪ সালে ফরাসি ওপেন জেতায় একই সঙ্গে চারটি গ্র্যান্ড স্লাম জেতার বাসনাও তাঁর কাছে অধরা থাকেনি। আবার ১৯৮৪ সালে জেতা চারটি গ্র্যান্ড স্লাম উইমেনস ডাবল্‌সও দৃষ্টান্ত! ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭, মাত্র তিন বছরে ১১টা গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনাল কোর্টে তাঁর জোরালো উপস্থিতি। আর অবশ্যই অর্ধেকের বেশি, অর্থাৎ ছ'টিতে চ্যাম্পিয়ন তিনি। ঠিক এই সময় ফাটাফাটি ফোর হ্যান্ড দিয়ে টেনিসকে শাসন করতে স্টেফির আবির্ভাব। তবে স্টেফির স্টাইল কি তাঁর খেলাকে আদৌ কোণঠাসা করতে পেরেছিল? সিদ্ধান্তে পৌঁছানো মুশকিল। তবে প্রতিবার প্রাণশক্তিতে ভরপুর খেলা খেলতে-খেলতে তিনি বোধ হয় তখন একটু রণক্লান্ত। তবে 'রণে ভঙ্গ' কথাটি মার্টিনার অভিধানে কোনও দিনই ছিল না। কারণ ১৯৮৭-র ইউ এস ওপেন বা ১৯৯১-এর ইউ এস ওপেনের সেমিফাইনালে তাঁর বাঁ-হাতি খেলা গ্রাফের ফোর হ্যান্ডকে হার মানিয়েছে। ১৯৯০ সালে ৩৩ বছর বয়সে তিনি জীবনের শেষ গ্র্যান্ড স্লামটি জেতেন। কিন্তু এরপরেও তো তাঁর জয়ের দীর্ঘ ইতিহাস। ২০০৩-এ উইম্বলডন এবং অস্ট্রেলিয়ান ওপেন মিক্সড ডাবলস ট্রোফিও তো লিয়েন্ডার-মার্টিনা জুটির। রেকর্ডের প্রশ্ন তো আসবেই! হ্যাঁ, সবচেয়ে বয়স্ক হিসেবে গ্র্যান্ড স্লাম জেতা, বিলি জিন কিংয়ের ২০ টি গ্র্যান্ড স্লামের রেকর্ড ছোঁওয়া বা গ্র্যান্ড স্লাম 'বক্সড সেট' ছুঁয়ে ফেলার রেকর্ড তো তাঁরই ঝুলিতে। সঙ্গে ১৬৭টি সিঙ্গল টপ-লেভেল শিরোপা, ১৭৭টি ডাবল্‌স শিরোপা এবং ১৮টি গ্র্যান্ড স্লাম (ন'টি উইম্বলডন, চারটি ইউ এস ওপেন, তিনটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং দু'টি ফ্রেঞ্চ ওপেন)। সেজন্যই হাজার ক্যামেরার ঝলকানি চিরকালই তাঁর শরণাপন্ন হতে বাধ্য! না, কোনও ফ্যাশন-শো বা অন্য কারণে নয়, এক এবং অদ্বিতীয় কারণ, তাঁর খেলা। বয়স বাড়লেও যে 'খেলার বয়স' বাড়ে না, এমন প্রমাণ কি আর রোজ মেলে?



স্টেফি তাঁকে পরাজিত দেখতে চাননি!

“ডোন্ট গো আন্দ্রে...”

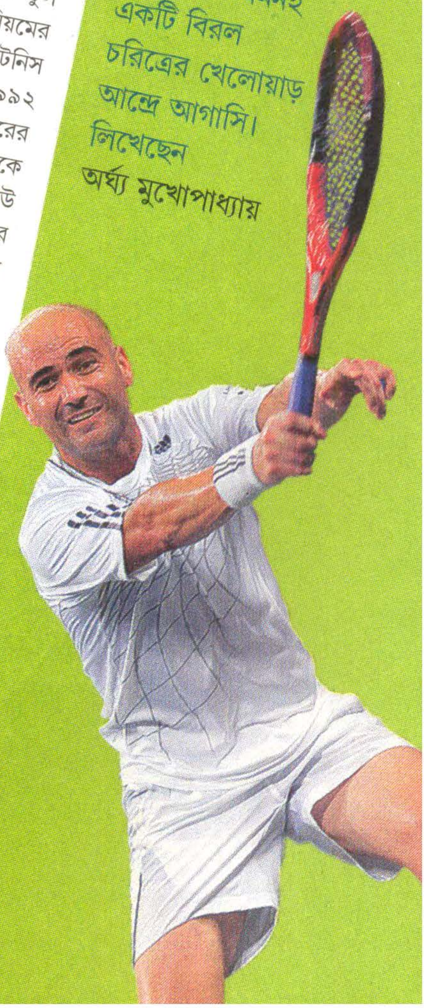
ঝুলিতে আটটি গ্রান্ড স্লাম ও ১৯৯৮ সালের অলিম্পিকে সোনা। কেরিয়ার এমন কিছু আহামরি নয়। তবুও তিনি জনপ্রিয়তায় আজও ফেডেরার, নাদালদের টেক্কা দেন। ঠিক এমনই একটি বিরল চরিত্রের খেলোয়াড় আন্দ্রে আগাসি। লিখেছেন

অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

তিনি হয়তো পিট সাম্প্রাসের চেয়ে বেশি ম্যাচ জেতেননি, বিয়র্ন বর্গের' মতো কৃতিত্বও ছিল না তাঁর, জন ম্যাকেনরো বা জিমি কোনরের মতো হয়তো টেনিসে বৈচিত্রও আনতে পারেননি, কিন্তু সেদিন রাত একটাতেও নিউ ইয়র্কের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম চিৎকার করে বলছিল, “ডোন্ট গো আন্দ্রে...ডোন্ট গো!” ম্যাচ শেষে রডিক বলতে বাধ্য হলেন, পরের ম্যাচ যদি তাঁর সঙ্গে আগাসির হত তা হলে ঘরের মাঠে তাঁকেই বিদেশি বলে ভাবতেন আমেরিকানরা। কেন? তবে কি তিনি জাদু জানেন? হ্যাঁ, হয়তো জানেন, না হলে এত দর্শকের মন কেউ কীভাবে জয় করে রাখতে পারে এতদিন! সেই ১৯৮৬ সাল থেকে তাঁর এই হৃদয় জয়ের যাত্রা শুরু। সেদিন ছিল আন্দ্রের উচ্ছ্বাসের দিন। চিৎকারে তিনি গোটা স্টেডিয়ামকেও হার মানাতেন। কিন্তু ইউ এস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে হেরে যাওয়ার পর এই উচ্ছ্বাসের ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। বরং নিজের দুই ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও গোটা বিশ্বের সামনে কেঁদে বিদায় নিলেন। না, হেরে যাওয়ার জন্য তিনি কাঁদেননি, কেঁদেছিলেন এটি জীবনের শেষ ম্যাচ ছিল বলে। গ্যালারিতে ফিরে স্টেফিকে শুধু একটা কথাই বলেছিলেন, “সরি!” হয়তো তাঁর এই অবসরের সিদ্ধান্ত দু' জনের ছিল না অথবা স্টেফি তাঁকে পরাজিত দেখতে চাননি!

১৯৭০ সালে লাস ভেগাসের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন জন্মসূত্রে ইরানি এবং টেনিসের প্রথম শিক্ষা বাবার কাছেই পান। কোনর ও নাসতাসের ভক্ত আন্দ্রে ১৯৮৪ সালে যোগ দেন নিক বোলেত্তিয়ারি অ্যাকাডেমিতে এবং শুরুতেই সকলকে চমকে ছ'টি খেতাব ছিনিয়ে নেন। অতএব বোঝাই যাচ্ছিল আন্দ্রে সেই ধরনের খেলোয়াড় নন, যাঁরা প্রথমেই চমক দেখালেও পরে হারিয়ে যান।

ক্রমেই আন্দ্রের বিদ্রোহী চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি পর-পর ঘাসের কোর্টে জিতে, বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ বলেন, “ছ' ফুটের কম উচ্চতার কোনও খেলোয়াড়ের পক্ষেই ঘাসের কোর্টে ট্রোফি জেতা সম্ভব নয়।” এই উক্তি ভুল প্রমাণ করেন। উইম্বেলডনের কুখ্যাত 'অল হোয়াইটস' নিয়মের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ এবং খেলতে না চাওয়া, গোটা টেনিস জগৎকে নাড়িয়ে দেয়। এই সব কিছুর মধ্যেই তিনি ১৯৯২ সালে জেতেন প্রথম পুরুষ সিঙ্গল্‌স গ্র্যান্ড স্লাম। কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৯৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পিট সাম্প্রাসকে হারিয়ে প্রথমবার এক নম্বর র‍্যাঙ্ক পান এবং একই বছরে, ইউ এস ওপেনের ফাইনালে সাম্প্রাসের কাছে হেরে যাওয়ার পরের দিন থেকেই তিনি ন্যাড়া হয়ে যান। যদিও তাতে তাঁর ফ্যানসংখ্যা কমে যায়নি। ২০০১ সালে ৩০ বছর বয়সে ফের জেতেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং এই বছরেই বিয়ে করেন আর-এক বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় স্টেফি গ্রাফকে। জন্ম নেয় তাঁদের দুই সন্তান জেডেন ও জ্যাজ় লি। ২০০৫ সাল নাগাদ পিঠের অসহ্য যন্ত্রণা তাঁর টেনিস জীবন ক্রমশই অনিশ্চিত করে তোলে। অবশেষে তিনি ঘোষণা করেন, ২০০৬ সালের ইউ এস ওপেনে তিনি অবসর নেবেন। ফ্ল্যাশিং মিডোর দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি ৩৬ বছর বয়সেও ছিলেন সমান তরতাজা। পিঠে ইঞ্জেকশন নিয়েও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় বেশি ফিট ছিলেন। তা হলে তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত কি একটু তাড়াতাড়িই নেওয়া হয়েছে? ঠিক এরকমই প্রশ্ন হয়তো অনেকেই তুলবেন। খেলোয়াড়দের পক্ষে কখনওই ভেবেচিন্তে অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই হাতে গোনা কয়েকজন বাদে পৃথিবীর বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হঠাৎ। তবে এটা সত্যি, তিনি অবসর ঘোষণা করলেও টেনিস ছাড়বেন বলেননি। অবসর নিয়ে একটি বিখ্যাত ঘটনা হল, ক্রিকেটার ডন ব্রাডম্যান জীবনের শেষ ম্যাচে শূণ্য রান করার কারণ হিসেবে তিনি অনেক দিন পরে বলেছিলেন যে, ব্যাট করার সময় তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল, তাই তিনি বলটি দেখতে পাননি এবং আউট হয়ে যান। আগাসির শেষ ম্যাচে পরাজয়ের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল কি না কে বলতে পারে!



সচিনকে আউট করার স্বপ্ন দেখেন ঝুলন

যাঁর বোলিংয়ের গতি ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার, বলের সিমকে ব্যবহার করায় যিনি অসাধারণ দক্ষ, তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। লিখেছেন সন্দীপ দাশগুপ্ত

গুড লেংথ



শহরের মেয়েরা গ্রামের মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে— খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এই ধারণা সব সময় খাটে না। বিশেষ করে সাঁতার, অ্যাথলেটিক্সের মতো খেলায়। জ্যোতির্ময়ী শিকদার, সোমা বিশ্বাস থেকে বুলা চৌধুরী, ঊর্মিলা ছেত্রী। খুঁজলে এমন হাজার প্রতিভার দেখা মিলবে, যাঁদের সকলেই গ্রাম বা মফস্‌সল থেকে উঠে এসেছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ঝুলন গোস্বামীর ক্ষেত্রেও এই কথাটা সত্যি। আশ্চর্যের কারণ, ঝুলন একজন ক্রিকেটার। মেয়েদের ক্রিকেটে বিশ্বের দ্রুততম বোলার নদিয়ার চাকদহের একটি মেয়ে, ভাবতেই কেমন লাগে। শৈশবে খেলার মাঠে দাপাদাপির সময় তাঁর সঙ্গী ছিল ছেলেরাই। সেখানেও খুব কঠিন একটা শর্তের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁকে টিকে থাকতে হয়েছে, "বোলিংটা তোর দ্বারা হবে না। এসব মেয়েদের কাজ নয়। ব্যাটিং একটুআধটু করতে পারিস...।" ঝুলন কিন্তু বলটাই কেড়ে নিয়েছিলেন ওদের কাছ থেকে।



আমরা শুনেছি, গার্নার, লিলি, টমসনরা বল করতে এলে ব্যাটসম্যানদের পা কাঁপত। মেয়েদের ক্রিকেটে ঝুলন বল করতে এলে ইংরেজ ক্রিকেটারদের নাকি ঠিক সেটাই হয়। আজ পর্যন্ত ভারতের মেয়েরা ৩৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। জিতেছেন মাত্র তিনটিতে। শেষ জয়টি এ বছরের সেপ্টেম্বরে, উপহার দিলেন ঝুলন। সেই সঙ্গে সিরিজও। 'টনটনের নায়িকা' আমাদের চাকদহের ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতার মেয়েটি দু'টো ইনিংসে পাঁচটি করে মোট ১০টি উইকেট পান। প্রথম ইনিংসে ৪৫ রান দিয়ে, দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩। ঝুলনের ক্যাপ্টেন মিতালি রাজ বলেছেন, "ঝুলন বল করতে এলেই ইংল্যান্ডের মেয়েরা কুঁকড়ে যেত। লক্ষ করতাম, সারাক্ষণ ওদের মধ্যে কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব।"

ঝুলন বলেছেন, "আমার মতে ক্যাথ্রিনই বিশ্বসেরা। ওই স্তরের একজন বোলারের সঙ্গে তুলনা হলে ভালই লাগে।"

এবার খুব চুপিচুপি একটা কথা বলে ফেলা যাক। ক্যাথ্রিনের যত বড় ভক্তই ঝুলন হোন না কেন, একজনের মতো বল করাটাই ওঁর স্বপ্ন। তিনিও ক্যাথ্রিনের দেশের বোলার, গ্লেন ম্যাকগ্রা। ঝুলন বলেছেন, "শুধু স্বপ্ন দেখি, কবে ম্যাকগ্রার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হবে। যদিও দেখা হলে কী বলব এখনও জানি না। হয়তো ঘাবড়ে যাব। টিপ্‌সটাও চাইতে পারব কি না কে জানে!"

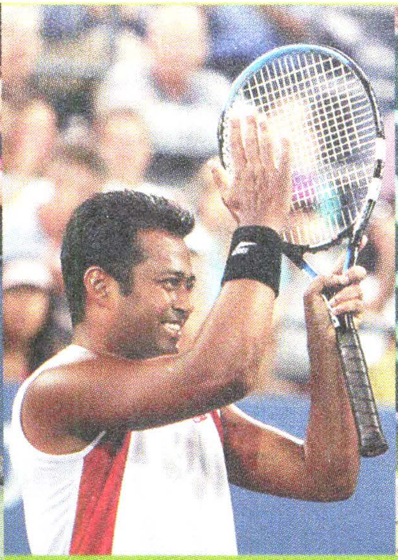
ছেলেবেলায় চাকদহে থাকার সময় ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা মেয়ে-ক্রিকেটারটি কপিলদেবেরও ভক্ত ছিলেন। কলকাতায় এসে প্র্যাকটিস যখন শুরু করলেন, তখন কপিল অবসর নিয়ে ফেলেছেন। "ক্রিকেটের সিরিয়াস ছাত্রী হওয়ার পর ম্যাকগ্রাই আমার আদর্শ। অবশ্য ভারতীয়দের মধ্যে শ্রীনাথকেও দারুণ লাগত!" বলেছেন ঝুলন।

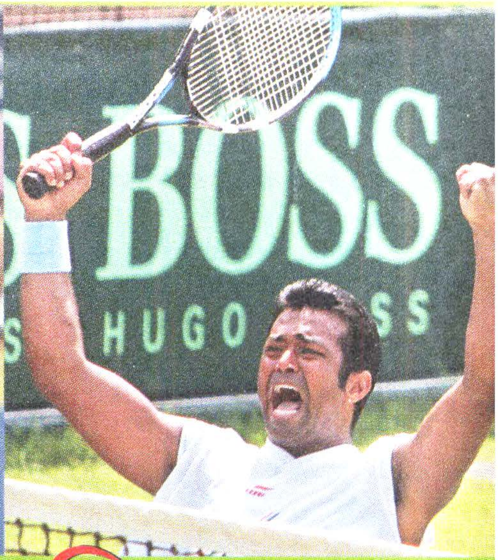
ম্যাকগ্রা সব সময়ই আমার কাছে একজন বিশেষ ক্রিকেটার। ব্যাটস্‌ম্যানদের মধ্যে ঝুলন সচিন তেন্ডুলকরের ভক্ত। খুব ইচ্ছে একবার সচিনের উইকেটটা নেওয়া। তা হলে হয়তো তাঁর ক্রিকেট জীবনের অর্ধেক জিনিস পাওয়া হয়ে যাবে।

যাঁর বোলিংয়ের গতি ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার, বলের সিমকে ব্যবহার করায় যিনি অসাধারণ দক্ষ, তিনি সচিনকে আউট করার স্বপ্ন দেখতেই পারেন।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যেভাবে মেয়েদের ক্রিকেটকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে, তাতে ঝুলন আশাবাদী, আগামী দিনে তাঁরা আরও ঘনঘন খেলার সুযোগ পাবেন। ঝুলন বলেন, "আমার লক্ষ্য শুধু ভাল খেলা নয়, টিমকে জিতিয়ে যাওয়াও।"







লিয়েন্ডারের সোনালি জয়

ফোরহ্যান্ড

উইম্বলডন তিনবার, ফরাসি ওপেন দু'বার, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন একবার। এবারই তিনি প্রথম জিতলেন যুক্তরাষ্ট্র ওপেন। লিখেছেন

তানাজী সেনগুপ্ত

একই ট্রোফি দু'বার—প্রথমবার পাওয়ার পনেরো বছর পর দ্বিতীয়বার! প্রথমবার অবশ্য জুনিয়র ডাবল্‌সে চ্যাম্পিয়ন, আর এবার সিনিয়র ডাবল্‌সে জয়ী। ১৯৯১-এ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে জুনিয়র ডাবল্‌সে জয়ের পর ২০০৬-এ সিনিয়র বিভাগে এই জয় প্রমাণ করে লিয়েন্ডার পেজের জয়ের খিদে কতখানি। খিদে না বলে বলা যায়, জয়েচ্ছা, আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস। এগুলো কতখানি থাকলে এই সাফল্য আসে, তা আর-একবার প্রমাণ করলেন ৩৩ বছরের লিয়েন্ডার আদ্রিয়ান পেজ।

ভারতের টেনিস-নক্ষত্র লিয়েন্ডারের কাছে গ্র্যান্ড স্লাম জয় নতুন কিছু নয়। ডাবল্‌স ও মিক্সড ডাবল্‌স জুটিতে তিনি বরাবর দুর্দান্ত খেলেন। চারটি গ্র্যান্ড স্লামের তিনটি আগেই জিতেছিলেন, উইম্বলডন তিনবার, ফরাসি ওপেন দু'বার, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন একবার। মোট ছ'বার। এবারই প্রথম জিতলেন যুক্তরাষ্ট্র ওপেন। চারটি গ্র্যান্ড স্লাম জয় নিঃসন্দেহে অসাধারণ কৃতিত্ব— খুব কম খেলোয়াড়ই এই চার ধরনের কোর্টে সাফল্য পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে আছেন মহেশ ভূপতি এবং মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার মতো কিংবদন্তি খেলোয়াড়। এবার সঙ্গী মার্টিন ড্যাম।

চেক প্রজাতন্ত্রের মার্টিন ড্যাম বয়সে লিয়েন্ডারের চেয়ে এক বছরের বড়। দু'জনেই অবশ্য ষোলো বছর পেশাদার সার্কিটে টেনিস খেলছেন। অভিজ্ঞতায় যেমন দু'জনেই এগিয়ে, বোঝাপড়াতেও দু'জনের মিল অনেক। কোর্টে অমিল বেশি—লিয়েন্ডার সব সময় তেতে থাকেন, ড্যামের ঠান্ডা টেম্পারামেন্ট। দু'জনের প্রতি দু'জনের আস্থা ও বিশ্বাস কিন্তু অসম্ভব। কোর্টের বাইরে দু'জনের মিল খুব, যেমন—দু'জনেই ফরাসি খাবার খেতে ভালবাসেন।

নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে এগিয়ে লিয়েন্ডার। তাঁরই পরিকল্পনায় দু'জনে এগিয়েছেন এবং একের পর-এক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে ফাইনালেও মরণপণ লড়াই করে জিতেছেন বিশ্বের দু'নম্বর জুটি জোনার্স বর্কমান-ম্যাক্স মির্নির বিপক্ষে। সার্ভ-ভলি আর রিটার্নের জোরে ম্যাচ বের করে নিয়েছেন তাঁরা। উচ্ছ্বসিত ড্যাম লিয়েন্ডারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লিয়েন্ডারের প্রশংসা করেছেন তাঁর মিক্সড ডাবল্‌স পার্টনার মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাও।

কলকাতার ছেলে লিয়েন্ডারের এই আগ্রাসী ও লড়াকু মনোভাবের পরিচয় আমরা অবশ্য অনেকবার পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে সিঙ্গল্‌সে পেশাদার সার্কিটে তিনি তেমন সাফল্য না পেলেও দেশের হয়ে ডেভিস কাপ, এশিয়ান গেম্‌স এবং অলিম্পিকে অসাধারণ খেলেছেন। অনেক নিশ্চিত পরাজয়ের ম্যাচকে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় জয়ে পরিণত করেছেন লিয়েন্ডার। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, দেশের হয়ে খেলার সময় অন্য এক লিয়েন্ডার যেন বেরিয়ে আসেন—এই মানসিকতার জোরেই তিনি এখনও ভারতের পয়লা নম্বর 'টেনিস স্টার'।

যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে জয়ের সুবাদে লিয়েন্ডার ও মার্টিন ড্যাম জুটি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন উঠে এলেন পাঁচ নম্বরে। লিয়েন্ডার ব্যক্তিগত র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢুকে গেলেন প্রথম দশের মধ্যে—১২ থেকে তিনি এখন ১০ নম্বরে। লিয়েন্ডার দেখিয়ে দিলেন জয়ের ক্ষেত্রে বয়স কোনও বাধা নয়, ইচ্ছে ও লড়াকু শক্তিই আসল।



যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ট্রফি হাতে লিয়েন্ডার ও মার্টিন ড্যাম

আবার বিতর্কে শেন ওয়ার্ন

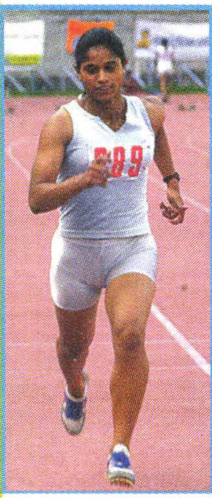


‘শেন ওয়ার্ন: মাই ইলাস্ট্রেটেড কেরিয়ার’ নামে লেখা আত্মজীবনীর কিছু অংশ সম্প্রতি একটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আত্মজীবনীতে ব্যক্তিগত জীবনের বেশ কিছু যন্ত্রণার কথা লিখেছেন তিনি। গত অ্যাসেজ সিরিজে এজবাস্টন টেস্টে কোচ বুকাননের নির্দেশ না মেনে বল করে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন ওয়ার্ন। পরে কোচ বুকাননকে আদৌ দরকার নেই বলে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডে বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন এই অস্ট্রেলীয় লেগ স্পিনার। এই মন্তব্যে অধিনায়ক রিকি পন্টিং রেগে খাপ্পা। প্রকাশ্যে ওয়ার্নকে জবাবদিহি করতে বলেছেন। যদিও ওয়ার্ন জানাচ্ছেন, এমন সমালোচনা তিনি করেননি। তাঁর বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে বিতর্ক এখানেই থেমে যায়নি। একদিনের ম্যাচে খেলতে চাইলেও ওয়ার্নকে দলে রাখতে নারাজ বুকানন।

ব্যতিক্রমী জিদান

বার্লিনে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ইতালির ফুটবলার মাতেরাজ্জির বুকে ঢুসো মেরে ‘খলনায়ক’ হয়ে জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ফ্রান্সের জিনেদিন জিদান। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে দাঁড়ালেও, ক্লাব ফুটবলে এখনও রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি শেষ হয়ে যায়নি। অবসর নেওয়ার পর তিনি স্পেনেই আছেন। খবর হল, চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত রিয়াল তাঁকে ছ’ লক্ষ ইউরো, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় চার কোটি টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু জিদান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রিয়ালের কাছ থেকে আর একটি ইউরোও নেবেন না। অথচ চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে মার্কেটিং-এর কাজের সঙ্গে জুনিয়র দলকেও প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করে যাবেন। পেশাদার জগতে জিদানের এই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তে ফুটবল বিশ্ব অবাক।





রঞ্জিতার নতুন রেকর্ড

বাবা নিকুঞ্জ রায় যখন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তখন হুগলির রবীন্দ্রনগরের মেয়ে রঞ্জিতা রায়ের বছর এগারো বয়স। অনটনের সংসার। চার বোনের মধ্যে দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেলেও মা কাকলি রায় আর যমজ বোন রীতার সঙ্গে বিড়ি বেঁধে সংসার বাঁচানোর রসদ জোগাড় করতে করতেই গরিব ঘরের মেয়েটি অ্যাথলিট হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই মেয়েটিই এখন রাজ্যের দ্রুততম অ্যাথলিট। ক’দিন আগেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ২১ বছরের মেয়েটি ১১.৭ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করে নতুন রেকর্ড গড়লেন। ভেঙে দিলেন ১৭ বছর আগের গড়া রেখা চক্রবর্তীর ১১.৮ সেকেন্ডের রেকর্ড। কোচ তপন ঘোষের ছাত্রীটির চোখে এবার আরও বড় স্বপ্ন।

ভরসা জোগাচ্ছেন পাহিরা

ভাল খেলেও মোহনবাগানের কাছে সম্মানের লড়াইয়ে হেরে গিয়েছে লাল-হলুদ দল। তবে মহমেডানের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্ট ‘প্রিমিয়ার লিগ’ জয়ের দৌড়ে বেশ ভাল জায়গায় আছে ইস্টবেঙ্গল। তাঁর কোচিংয়ে লাল-হলুদ দল এখনও কোনও ট্রোফি পায়নি। তবে ময়দানে প্রথম ব্রাজিলীয় কোচ হিসেবে আবির্ভাব কার্লোস আলবার্তো পাহিরার। লাল-হলুদে ব্রাজিলীয় ঘরানা আনতে চেয়ে সমর্থকদের ভরসা জোগাচ্ছেন তিনি। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পরাজয়ের পরেও তাই ইস্টবেঙ্গল শিবিরে তাঁর কদর একটুও কমেনি।

পুরস্কৃত পঙ্কজ আডবাণী



দেশের অনেক খেলোয়াড় এবার ‘অর্জুন’ হয়েছেন। বাংলার তিরন্দাজ দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়, দাবাড়ু সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায় এবং টেবল টেনিসের সৌমদীপ রায় অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু ‘রাজীব গাঁধী খেলরত্ন’ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন দেশের আর-একজন খেলোয়াড়। তিনি ২০ বছরের তরুণ স্নুকার ও বিলিয়ার্ড বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, বাঙ্গালোরের পঙ্কজ আডবাণী। এবার দেশের সেরা খেলোয়াড় হওয়ার দৌড়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়কেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন তিনি। গত বছর এশীয় পর্যায়েও সেরা হয়েছেন। এখন ডিসেম্বরে আসন্ন দোহা এশিয়ান গেমসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছেন পঙ্কজ।

চন্দন রুদ্র


মাম্মা,
রান্না কি আমার খাবারের শুধু
খারাপ জিনিষ-ই নষ্ট করে?
ভুল ভাবে রান্না করলে, খাবারের কিছু মুখ্য পুষ্টির হানি হতে পারে। আপনার শিশুর আহারে এই সমস্ত পুষ্টির অভাব তার শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে প্রতিবন্ধিতার সৃষ্টি করতে পারে। নতুন জুনিয়ার হরলিকস্-এ আছে অত্যন্ত জরুরী পুষ্টির 100% দৈনন্দিন কোটা* এবং DHA যা আপনার বাচ্চাকে শারীরিক স্ফূর্তি ও বুদ্ধিতে প্রখর থাকতে সাহায্য করে। ওর প্রতিদিনের আহারের সঙ্গে, নতুন জুনিয়র হরলিকস্ আপনার বাচ্চাকে A থেকে Z পুষ্টি** সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে।
A
Z
পুষ্টি
এখন DHA-এর সাথে
NEW
JUNIOR Horlicks
1 2 3
*ফলেট, ভিটামিন B6, ভিটামিন সি, ভিটামিন B2, ভিটামিন B12, আয়রণ এবং ক্যালসিয়াম, দু-কাপ - এর মাপে - ইউ এস গাইডলাইন্স 2001 অনুযায়ী।
এই প্রোডাক্টটি বাচ্চার দুধের পরিবর্ত নয় বা 2 বছরের কম শিশুর আহার নয়। **জুনিয়ার হরলিকস্ 1-2-3™ একটি নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট, যেটা ডেইলি ব্যালেন্সড্ ডায়েট - এর অংশ হিসাবে আপনার বাচ্চার নিউট্রিশনাল প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সাহায্য করে।
5521.2006BEN

ANANDAMELA OCTOBER 2006 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06 INR 10.00

